

সশানকোণ

একটি বাংলা সাহিত্যের ওয়েবজিন www.ishankon.com

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮ সংখ্যা

সম্পাদকঃ সদানন্দ সিংহ singhasada@gmail.com

বিনিময় মূল্যঃ বন্ধুত্ব

৩) বাস্তব — লোপামুদ্রা সিংহদেব

সূচিপত্ৰ

নিবন্ধ

১) অ্যারিস্টটলের কবিগণ — সদানন্দ সিংহ	পৃষ্ঠা-০০৫
২) যুদ্ধ ও মেয়েরা — তৃষ্ণা বসাক	পৃষ্ঠা-০০৭
ছোটগৰ্প	
১) এই রেলগাড়িটা আটকে দেবো — কিশোর রঞ্জন	দে পৃষ্ঠা-০০৯
২) উদ্ধার — নকুল রায়	পৃষ্ঠা-০২৬
৩) ইচ্ছে আখ্যান — বৈদূর্য্য সরকার	পৃষ্ঠা-০৩৬
৪) নষ্ট বীজের প্রভু — সদানন্দ সিংহ	পৃষ্ঠা-০৪৩
৫) সংকেত বিজয়া দেব	পৃষ্ঠা-০৪৯
মুক্তগদ্য	
১) বিশ্বাস করা ভালো — শুভেশ চৌধুরী	পৃষ্ঠা-০০৭
অণুগল্প	
১) গাছ — সদানন্দ সিংহ	পৃষ্ঠা-১৪২
২) ভ্রান্তি — রণজিৎ রায়	পৃষ্ঠা-১৪৪
	•

পৃষ্ঠা-১৪৭

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

অন্যান্য

লেখাজমা পৃষ্ঠা-১৫৬ আলোচনা পৃষ্ঠা-১৫৫ মুখোমুখি পৃষ্ঠা-১৫২

কবিতা

পৃষ্ঠা- ৫৩-১৩৭

তৈমুর খান, দিশারী মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, প্রণব বসুরায়, তনিমা হাজরা, তমা বর্মণ, পৃথা রায় চৌধুরী, উমা মণ্ডল, সুবিনয় দাশ, শুভেশ চৌধুরী, অমিতাভ কর, অজিতা চৌধুরী, মীনা মুখার্জী, নীলাদ্রি ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ লায়েক, কিশলয় গুপ্ত, সুতপা চক্রবর্তী, নন্দিনী পাল, চিরশ্রী দেবনাথ, বনানী ভট্টাচার্য, উদয় শংকর দুর্জয়, পায়েল দেব, রফিক উদ্দিন লস্কর, রণজিৎ রায়, সমর চক্রবর্তী, মেঘনা চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব সেন, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ রায়, বাপ্পা চক্রবর্তী, অভিজিৎ চক্রবর্তী, পার্থ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, সদানন্দ সিংহ, দেবীস্মিতা দেব, তোফায়েল তফাজ্জল, সুদীপ ঘোষাল, সুদীপ্ত বিশ্বাস,

ছড়া

পৃষ্ঠা-১৩৮-১৪১

রফিক উদ্দিন লস্কর দেবীস্মিতা দেব

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা ১৫০

নিবন্ধ

অ্যারিস্টটলের কবিগণ

সদানন্দ সিংহ



প্লেটোর আদর্শ শিষ্য অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খৃষ্টপূর্ব) তৎকালীন সময়ে কবি এবং কবিতা নিয়ে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা অন্য কেউ সেভাবে বলতে পারেননি।

অ্যারিস্টটলের মতে কবিতা বিভিন্ন ধরনের। একটি ভালো কবিতার গঠন এবং বিভাজন তার উপাদান অংশেই থাকে। তিনি কবিতাকে একটি অনুকরণের মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করেন যা চরিত্র, আবেগ বা কর্মের মাধ্যমে জীবনকে প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিলিপি করার চেষ্টা করে। তাই কবিতা বিভিন্নভাবে বিস্তৃত হয়ে মহাকাব্য,

ট্র্যাজেডি, কমেডি, লিরিক্যাল, এমন কি স্তোকবচন সহ কোনো লৌকিক নৃত্যও হতে পারে।

অ্যারিস্টটলের মতে কাউকে বাস্তব জীবন থেকে আরো উন্নত ও অতি ভালো দেখাতে গিয়েই ট্র্যাজিডির জন্ম। কমেডি অন্যদিকে নিম্নতর টাইপ প্রকাশিত করে। অপরপক্ষে এপিক কবিতা ট্র্যাজেডির মত উন্নতচরিত্রের লোকদের নিয়েই হয়, যা বর্ণনাধর্মী, কিন্তু ট্র্যাজেডির মত শেষ হয়না। ট্র্যাজেডি ছয় উপাদান বহন করেঃ- প্লাট, চরিত্র, কথা, চিন্তাধারা, প্রদর্শনী এবং গান। প্লাট ট্র্যাজেডির আত্মা। একটি প্লাটের শুরু, মধ্যম এবং শেষ থাকতে হবে; এর তাৎপর্য সর্বজনীন হতে হবে।

চরিত্র তৈরি করার সময় একজন কবিকে চারটি জিনিসের ওপর লক্ষ্য রাখবে হবে। প্রথমত নায়ককে ভাল মানুষ হতে হবে, এবং তার বক্তব্যে উদ্দেশ্যপূর্ণ নৈতিকতা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, নায়ককের কাজগুলি হবে নির্ভুল এবং বীর রসাত্মক। তৃতীয়ত, নায়কের অবস্থান হবে জীবনের সত্যে। চতুর্থত নায়ককে হতে হবে পক্ষপাতহীন।

কবি নিজের অবস্থান নিয়ে, বা তার কল্পিত বিষয়গুলি নিয়ে লিখবেন, অথবা যা হওয়া উচিত তা নিয়ে লিখবেন। কাব্যিক লেখায় রূপক বা সমসাময়িক শব্দ থাকা বাপ্ত্নীয়। কবি যখন ভুলগুলি অনুকরণ করে তখন কাব্যের ক্রুটিগুলি বেরিয়ে আসে এবং এইভাবে কবিতার সারাংশ ধ্বংস করে দেয়। তবে আংশিক ক্রুটি পুরো কাজকে ধ্বংস করে দিতে পারেনা।

কবিদের বিষয়ে এতসব বলার পরেও অ্যারিস্টটল তার কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের নির্বাসিত করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় কবিরা সত্যিই হয়তো কোনো কালেই দায়িত্ববান নন।



যুদ্ধ ও মেয়েরা তৃষ্ণা বসাক

'হুঁ, যুদ্ধের বছরগুলি। ভাবলেই মনে হয় সবসময় যেন বৃষ্টি পড়তো। আসলে তা নিশ্চয়ই নয়, তখনও নিশ্চয়ই রোদ-টোদ উঠত। আমার কিন্তু খালি বৃষ্টি পড়ার কথাটাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। ওয়েলিংটন বুট পরে বেরুতাম। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতাম। ঢুকেই ভিজে বুটজোড়া ছেড়ে ফেলতে হতো। তারপর পা গরম করতাম। কখনো কখনো আমার প্র্যামটাতে উঠে বসতাম, কম্বলে পা ভালো করে মুড়ে বসে থাকতাম। সেটা নিঃসন্দেহে আমার মাতৃজঠরে ফিরে যাবার ইচ্ছাটাকেই প্রকাশ করতো পরোক্ষে। বিছানাতেও মুখের ওপর

কম্বল টেনে নিয়ে একটা নরম, গরম, অন্ধকার, নিরাপদ জায়গা সৃষ্টি করে নিতাম। এখনো তো আমি জ্যাকের সঙ্গে অন্ধকার কোনাকাঞ্চিতে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে উত্তাপ পোহাতে আর আদর বিনিময় করতে ভালোবাসি--'

নোটন নোটন পায়রাগুলি/কেতকী কুশারী ডাইডন) হ্যাঁ, নরম গরম, অন্ধকার, নিরাপদ জায়গা, মাতৃজঠরের মতো। সেখানে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে একটা গণ-হিস্টোরিয়ায় পরিণত হয়েছিল যুদ্ধোত্তর দিনগুলিতে। তারই ফলশ্রুতি বেবি বুম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী শিশু জন্মের হারকে ছাপিয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এর পেছনে কি আপাতত শান্তিকল্যাণ? অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত? ঐতিহাসিক Elaine Tyler May "Homeward bound: American families in the cold war era" বইতে কিন্তু অন্য কারণ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন এর পেছনে আছে ধ্বংস, হতাশা এবং নিউক্লিয়ার ওয়্যারের ভয় থেকে পালানোর মনোবৃত্তি। আর পালিয়ে মানুষ ফিরতে চেয়েছে

"Americans turned to the family as a bastion of safety in an insecure world... cold war ideology and the domestic revival (war) two sides of the same coin" আর এর অব্যবহিত ফল এসে পড়ল মেয়েদের জীবনে। যারা যুদ্ধের দৌলতে ক্ষণিকের জন্যে বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ পেয়েছিল, ভাবতে শুরু করেছিল তাদের স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ সমাগত বুঝি, তাদের স্বপ্নভঙ্গ হল। তারা বুঝতে পারল আসলে যুদ্ধে চলে যাওয়া পুরুষের ফাঁকা জায়গাটা সাময়িক ভরাট করতে তাদের ডাকা হয়েছিল, যুদ্ধ থেকে ছেলেরা ফিরে আসতেই, শুধু পুর্নমূষিক

ভবঃ হল না, গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকাটা যেন আরো গৌরবমন্ডিত করা হল খুব

সুচুতরভাবে। গৃহকর্ত্রী ছাড়া গৃহের সুরক্ষাবলয় কেই বা নির্মাণ করবে? বিভিন্ন

বিজ্ঞাপন, টেলিভিশান শো, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র, 'ডিক অ্যান্ড জেন' সিরিজের

মাতৃজঠরের মতো উষ্ণ পারিবারিক আশ্রয়ে, প্রেয়সীর বাহুবন্ধনে।

বই — সব জায়গায় গরিমা পেল রমণীয়, ঘরেলু মা ও সকাল থেকে রাত বাড়ির বাইরে থাকা পুরুষালি বাবারা। 'more work for mothers' গ্রন্থে Ruth Schwartz Cowar দেখিয়েছেন সেইসময়ে কেরিয়ার করতে চাওয়া মেয়েদের কীভাবে ব্যঙ্গ করা হত, তাদের ডাকা হত 'unlovely woman', 'lost', 'suffering from penis envy', 'ridden with guilt complexes', 'man-hating' এইসব বিশেষণে।

যুদ্ধোত্তর এই গৃহকেন্দ্রিকতার অবশ্য কারণ ছিল, গ্রাহ্য কারণ। যে অবর্ণনীয় ক্ষতি, মৃত্যু, বেদনা, অস্থিরতার মধ্য দিয়ে মানুষ গিয়েছিল তাতে গৃহমুখী হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। যুদ্ধ তো, পরিবারের আশ্রয় যে ঘর তার স্বাভাবিক চেহেরাই বদলে দিয়েছিল।

'প্রত্যেক রাতে...। জানলার ওপরে করাগেটেড ধাতুর পর্দা দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করা হতো। গেটের কাছে একটা গাছে কতকগুলো চাকতি ঝুলিয়ে রাখা হতো রাতে। যাতে বোমা পড়লে এয়ার রেইড ওয়ার্ডেনরা জানতে পারে ক'টা লাস খুঁজে বের করতে হবে। ভোরে দুধের বোতলের সঙ্গে সঙ্গে চাকতিগুলোকেও ঘরের ভেতর নিয়ে যাওয়া হতো। রাতে তো সর্বদাই ব্ল্যাক আউট থাকতো, রাস্তাগুলো নিষ্প্রদীপ, সব জানলা ভালো করে ঢাকা, গাড়ির আলোও ম্লান করে দেওয়া। তাছাড়া সেকালে তত গাড়িও ছিলোনা। বাসের জানলায় পুরু হলদে কাগজ সাঁটা থাকতো, যাতে কাঁচ ভেঙে যাত্রীদের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে না পড়ে। রাতে সাইরেন শুনিলেই আমার গা দিয়ে ঠান্ডা ঘাম ছোটে। আমি একজন মহিলাকে চিনি, যুদ্ধ শুরু হবার সময়ে যাঁর বয়স ছিল বারো। তিনি বলেন যুদ্ধ তাঁর প্রজন্মকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে, তার কারণ যুদ্ধের সময়ে তাঁদের দিনগুলো কাটত অতিরিক্ত উত্তেজনার মধ্যে, যেন জীবনটা একটা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার। একটা দিন থেকে আরেকটা দিনে পৌঁছতেই কত টেনশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো, আগামী কালের মুখটা আদৌ দেখা যাবে কিনা তারই ছিরতা

থাকতো না। এত কান্ডের পর বাকি জীবনে যা ঘটলো তা সবই বিস্বাদ, সবই আশাভঙ্গ, অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স যেন"

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও তো তার মাশুল গুনে চলতে হল সারা পৃথিবীকে। হারিয়ে গেল পুরনো ঠিকানা।

'যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর আমরা একটা বিরাট বাড়িতে উঠে গেলাম মনে পড়ছে। সেই বাড়িটার চারিদিকে অনেক বাড়িই বোমায় নষ্ট হয়ে গেছিল। শুধু ঐ বাড়িটাই রেহাই পেয়েছিলো, কিন্তু পুরোপুরি নয়, ক্ষতির চিহ্ন অনেক ছিলো, ছিলো অনেক ফাটল। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি বলে ভাড়া খুব কম ছিলো।'

কিংবা 'আমরা যখন গাঁয়ে তখন বেলফাস্টে আমাদের দোকান আর বাড়িতে বোমা পড়ে। ভাগ্যিস আমরা পালিয়ে গেছিলাম, নয়তো সবাই স্বর্গে যেতাম, যুদ্ধের শেষে ফিরে এসে দেখি আমাদের সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

এই ছাইয়ের ওপর নতুন করে সংসার পাততে গিয়ে বাড়ির মেয়েদের অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হল। তাছাড়া বোমার ভয়ে গাঁয়ে পালানো পরিবারের মেয়েদের মানিয়ে নিতে হল গ্রামের পরিবেশে। সব কিছু আক্রা, তাই শুরু হল রেশনিং। '... খাবারের, পোষাকের, কয়লার, তাছাড়া বিদ্যুতের ঘাটতিও ছিলো, ফলে সর্বদা ঠান্ডায় জমে হিম হয়ে থাকতাম। ঠান্ডার স্মৃতিটা বড় প্রখর' আর এই পোষাকের রেশনিং এক ধাক্কায় মেয়েদের স্কার্টের ঝুল কমিয়ে ফেলল অনেকখানি। ফ্যাশনের তাড়না নয়, নেহাত কাপড়ের অভাবের জন্যেই চালু হল মিনি স্কার্ট। যুদ্ধ শুরু না হলে তাকে হয়তো অপেক্ষা করতে হতো আরো দু এক দেশক।

পৃথিবীর উল্টোপিঠে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পরোক্ষভাবে পড়েছিল। সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যে জাপানী বোমার ভয়ে গ্রামে পালানোর ভূরিভূরি নিদর্শন মিলবে। যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেচারী' গল্পটি। 'কলিকাতায় বোমার হাঙ্গামা উপলক্ষে বহুদিনের কলিকাতা-বাসা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে গিয়ে

ভগ্নিপতির বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছি। একেবারে অজ পাড়া গাঁ। রেলস্টেশন হইতে সাত ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া অথবা গরুর গাড়ীতে গেলে গ্রামে পৌঁছানো যায়। ভগ্নিপতিদের মেটে বাড়ী, তাহাদেরই স্থান সঙ্কুলান হয় না। তবে বিপদের দিনে, আপাতত বোমায় মরিতে বসিয়াছি দেখিয়া তাহারা নিজেদের অসুবিধা করিয়াও বাহিরের ঘরখানি আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিল।

পরিবারের কর্তা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন বহুদিন কলকাতায় থেকেও বাড়ি করার সঙ্গতি হয়নি বলে। কারণ 'জাপানী বোমার ঘায়ে সে বাড়ী কতদিন টিকিত? আমার যেসব বন্ধুবান্ধবকে কলিকাতায় বাড়ী করিবার জন্য এতদিন হিংসা করিতাম, আজ তাহাদের প্রতি সে হিংসার ভাব করুণা ও সহানুভূতিতে পরিণত হইল। বেচারীদের পয়সাগুলো অনর্থক নষ্ট হইল।'

প্রথম প্রথম তাঁর স্থী গ্রামের প্রকৃতি দেখে পুলকিত, বনের মধ্যে প্রচুর চালতা এমনি পড়ে আছে দেখে তাঁর উচ্ছাস বাঁধ মানে না।

'আমার স্ত্রী শহরের মেয়ে, পাড়াগাঁয়ের বনে বাগানে পাকা চালতা শীতকালে পড়িয়া থাকা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়, তাহা না বলিয়া তাঁহার আনন্দটাকে আরো ঘনীভূত হইবার অবকাশ দিবার জন্য দুজনে বনের দিকে ছুটিয়া গেলাম।' অবশ্য শীতকালের পরে গ্রীষ্ম, অবশেষে ভয়াবহ বর্ষা এল তাঁর মোহভঙ্গ হতে দেরি হল না। 'গ্রীষ্মকাল কাটিয়া আষাঢ় মাসের প্রথম সেই ভীষণ বর্ষা পড়িল, শ্রাবণ মাস যায় সে বর্ষার বিরাম নাই, চারিধার জলে ডুবুডুবু, রাস্তাঘাট কাদায় হাবড়, বন জঙ্গলে উঠান ঢাকিয়া গেল। আমার স্ত্রী বলিলেন — ওগো। কলকাতায় সবাই ফিরছে, চল আমরাও যাই — এখানে থাকা যায় না। মরি, সেখানে বোমা খেয়ে মরব। ভিজে কাঠে উনুন ধরিয়ে আর ফুঁ পেড়ে চোখ কানা হয়ে যাবার যোগার হয়েছে, এ আর সহ্য হয় না।'

তবু যুদ্ধ মানে শুধু ভিজে কাঠে উনুন জ্বালাবার চেষ্টাই নয়, প্রেমের আগুনেও জ্বলে উঠেছিল কোথাও কোথাও। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে দেখি আমেরিকান সৈনিকের নীল চোখের যাদুতে জড়িয়ে যাচ্ছে কিশোরী, আরো আরো অনেকের লেখায় দেখা যায় এইসব দীর্ঘদিন বাড়িছাড়া সৈনিকদের যৌন ক্ষুধা মিটিয়ে রোজগারের চিরাচরিত রাস্তাও সুগম করেছিল যুদ্ধ। রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্পে দেখি সৈনিকদের ছোঁড়া খাবারের জন্যে গোটা গ্রাম কিভাবে ভিখিরি হয়ে গেছিল। 'সপ্তপদী' চলচ্চিত্রে রিনা ব্রাউনকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিলিটারিতে যোগ দিয়ে মদ্যপান ও পুরুষসঙ্গ সম্পর্কে পুরনো ধ্যানধারণা ঝেড়ে ফেলতে দেখা যায়। তাকে দেখা হয় সমাজচ্যুত খারাপ মেয়ে হিসেবে। অনেক মেয়েই যুদ্ধে মিলিটারি নার্সের কাজ নিয়েছিল। যেমন 'নোটন নোটন পায়রাগুলি'র পিকসি মিলিটারি নার্স হিসেবে দিল্লীতে পোম্টেড ছিলেন। বহুদিন পর্যন্ত এটাই ভাবা হত যুদ্ধে মেয়েদের বাঁধাধরা জায়গা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু এই ধারণাটাকেই তছনছ করে দিল।

যে হাত শিশুর দোলনায় দোল দেয়, সে হাত দেশ সামলায়। আর প্রয়োজনে যুদ্ধও কি করে না? ইতিহাস শুধু হেলেন আর দ্রৌপদীদের নিয়েই তৈরি নয়, যাদের জন্যে যুদ্ধ বাধে যুগে যুগে, চিত্রাঙ্গদা, লক্ষ্মীবাই, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীস্বামীনাথনরাও আছে, আছে আধুনিক যুগের গ্রেস হপাররা, যারা সরাসরি অংশ নিয়েছিল যুদ্ধে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ভূমিকায় নয়, বীরাঙ্গনার বেশে। শুধু রক্ত মোছানো নয়, যারা প্রয়োজনে রক্ত ঝরাতেও পারে। তারা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালায়নি শত বিপদেও, পিঠে অস্ত্রলেখার অপবাদ কেউ দিতে পারবে না তাদের। আসলে যুদ্ধে বাহুবলের জায়গায় যত মেধা, প্রযুক্তি ও রণকৌশলের গুরুত্ব বেড়েছে, ততই সহজ হয়েছে মেয়েদের অংশগ্রহণ। যদিও, এখনও শুধু মেয়ে হওয়ার জন্যেই প্রচুর অসুবিধেয় পড়তে হয়। শৌচাগারের অলভ্যটা, পুরুষ সহকর্মীর যৌন নির্যাতন, পদে পদে অপমান অনেক নারী সেনানীকেই আত্মহননের দিকে ঠেলে দেয়। লেফটেন্যান্ট সুস্মিতাকে মনে আছে তোং কেমিস্ট্রির স্লাতক মেয়েটিকে সেনাবাহিনীতে দেওয়া হয় কিচেন সামলানোর

দায়িত্ব, অবসাদের শিকার সুস্মিতা বেছে নেয় আত্মহননের পথ। তবু যুদ্ধে মেয়েরা যাচ্ছেই। মুসলিম দেশগুলিতে আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা নারীর হাতে স্টেনগান-এর দৃশ্য আকছার চোখে পড়ে।

দুটি বিশ্বযুদ্ধ, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মেয়েদের জগৎটা অনেক বড় করে দিয়েছিল। বেশির ভাগ পুরুষ যুদ্ধে চলে যাওয়ায় কলকারখানায় খালি হয়ে যাওয়া পদে প্রচুর মেয়েরা ঢুকতে পেরেছিল। মার্কিন মুলুকে অনেক মেয়েই সরাসরি যুদ্ধের কাজ করেছিল। যদিও বেশিরভাগ সেক্রেটারি, কেরানি। ট্রাক দ্রাইভার, নার্স ও রাঁধুনি হিসেবে। নতুন প্রযুক্তি তাদের খুব কমই ব্যবহার করতে দেওয়া হত। এর একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ওয়াম্প অর্থাৎ উইমেন এয়ারফোর্স সার্ভিস পাইলটস। এখানে মেয়েদের মিলিটারি এয়ার ক্র্যাফট চালাতে দেওয়া হত, ছেলেরা যার ফলে নিশ্চিন্তে যুদ্ধে যেতে পারত।

তবে মার্কিন মেয়েদের তুলনায় সোভিয়েত মেয়েদের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। মারিনা রাসকোভার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল নৈশ বোমারু বাহিনী, জার্মানরা এদের 'রাতের ডাকিনী' বলে। মেশিন গান চালাতে, নেভিগেশনে, যুদ্ধ জাহাজ এমনকি সরাসরি রণক্ষেত্রে বিচিত্র ভূমিকায় প্রায় দশ লাখ সোভিয়েত নারী অংশ নিয়েছিল।

জাপানের মতো রক্ষণশীল দেশেও যুদ্ধের ধাক্কায় বাইরের জগতে পা রাখার সুযোগ পায়। অস্ত্র কারখানা, ইলেকট্রনিক্স শিল্পে তারা বিপুল সংখ্যায় কাজ করতে থাকে। বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় এদেশের মেয়েদেরও কর্মজগতটা প্রসারিত হয়ে যায়, অচলাতনে ঢুকে পড়ে খোলা হাওয়া।

কথায় আছে 'শয়তানকেও তার প্রাপ্য দিতে হয়'। তাই ধ্বংস, মৃত্যুর প্রান্তর থেকে যে বারুদের গন্ধমাখা বাতাস ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে, জন্ম নিয়েছিল গণ-অবসাদ, আত্ম-বিচ্ছিন্নতা, সেই যুদ্ধের ঝুলিতে হিরোশিমা-নাগাসাকি আর গ্যাস চেম্বার ছাড়াও দুটি সদর্থক জিনিসও ছিল, তা অম্বীকার করা যাবে না।

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

একটি আধুনিক কম্পিউটার (এনিয়াক যার শুরু), অন্যটি নারীর ভূমিকার সম্প্রসারণ। যুদ্ধ আক্ষরিক অর্থেই মেয়েদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। শুধু রণক্ষেত্র নয়, শিল্প, কলকারখানায়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণায় সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন সুযোগ, নতুন নতুন কাজের জায়গা, যেখানে বিচিত্র ভূমিকায় মাটি কামড়ে লড়ে যাচ্ছে আজকের নারী।

সূত্ৰঃ

- ১. নোটন নোটন পায়রাগুলি, কেতকী কুশারী ডাইসন, আনন্দ পাবলিশার্স।
- ২. প্রযুক্তি ও নারী বিবর্তনের প্রতি-ইতিহাস, তৃষ্ণা বসাক, গাঙচিল।

মুক্তগদ্য

বিশ্বাস করা ভালো শুভেশ চৌধুরী



আমি বিশ্বাস করি, বেঁচে আছি, শুধু আমার জন্য নয়, জল দেওয়া আছে, সংসারে, সমাজে, আমিও তো, জল পান করি, তৃষ্ণা মেটাতে। আপনিও, সেও, এই প্রচেষ্টা, চাকা সচল রাখে, বিশ্বাস করি, অনন্ত বিশ্বের। বিদ্বৎ জনের বা প্রতীক হিসেবে ধরি, ক্ষুদ্র পিঁপড়ের বিশ্বাসটিও, এই চাকার বল। যাহা কিছু আছে, যা কিছু বর্তমান, একটি ধনাত্মক ক্ষমতার ঋণাত্মক ক্ষমতার উপর জয়। এই জয় ব্যক্তির জীবনে, সমষ্টির জীবনে ঘটে ও ভোরকে প্রত্যক্ষ করি, সত্য বিশ্বাস।

শিখিয়াছি সাংখ্য দর্শনে, নিত্য নৈমিত্বের দ্বন্দে, প্রতিটি পার হওয়া রাস্তা সমুদ্র, নাই ও আছির মধ্যে যুদ্ধ, বিশ্বাস, এই জয়টি ঘটায়। ক্লান্ত হয়ে পড়ে আছে যারা বা মাতাল ব্যতিক্রমী, তাদের হয়ে বিশ্বাস তার পরিবার তার শুভানুধ্যায়ীরা করেন, তাই উদ্ধার, পতন হতে, ওই ব্যক্তির। ব্যক্তি, মূল স্রোতে ফিরে এসে, আরো সবল, আরো বেশি ভালোবাসে, নিজেকে, সমাজকে।

যাহা অচল মুদ্রা, সঠিক ব্যবহারে তাই সচল লক্ষ্মী, বা বিদ্যা, চঞ্চল লক্ষ্মী, একবার ভাবে, ব্যক্তি বা সমষ্টিকে, স্থানচ্যুত করতে, বিশ্বাসটি সমাজ পরিবার থেকে পাওয়া।

একিলিসএর কথা মনে হয়, মনে হয় হার মানা শ্যামলশ্যামলীর কথা, যুদ্ধ কেউ হারে না, নিজে নিজেই না হারলে।

আজকাল অনেক পরামর্শদান সেবা আছে, মানুষ মানুষের পাশে থাকলে, বিচারালয়-এর তুলাদগুটির মতো হেলে থাকবে না, মাটির উপর পা দিয়ে দাঁড়াবেন একজন মানুষ ও প্রতিষ্ঠান। যদিও বিশ্বাস কখনও আরোপিত হয় না, ভিতর থেকে জাগতে হয়, তবু সার জল, তাপ, উত্তাপ তো আছেই, মালিকে আহবান করি।

ছোটগল্প

এই রেলগাড়িটা আটকে দেবো কিশোর রঞ্জন দে



১৯৬০

দাঙ্গার রাতগুলি একই রকম। ব্রহ্মপুত্রের রাতের কথা, ভয়ের রাতের কথা মনে পড়ে তোমার, মাগো! চারিদিকে ওরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে বসতবাটী, জ্যোৎস্লা ও আবীর। চা-জমি থেকে উঁচুতে আমাদের বাসভূমি থেকে — জ্বলতে থাকা আগুনদেখা যায়। সে আগুনের অর্থ আমি ও ভাইবোনেরা তখনো বুঝিনা। তোমার ও বাবার চোখে মার্চ মাসের রোদ্দুর নিভে যায়। প্রতিদিন সকালের দু-একটা পরিবার নিহত হবার খবর আসে মৃদু হরিধ্বনির মতো। হল্লা করতে করতে কিছু মানুষ আমাদের দিকে ছুটে আসলে আমাকে তৎক্ষণাৎ কোথায় লুকোতে হবে — জঙ্গলে কোনও গাছের আড়ালে নতজানু হয়ে, টুঁ শব্দটিও করা চলবে না, এসব

আমাকে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হতে তুমি। শুধু লুকোতে যাবার আগে ক্রীড়াসুখে উত্তেজিত হতাম, ঘুমিয়েও পড়তাম নিশ্চিন্তে।

তোমরা জেগে থেকে হয়তো অসমান রক্তপাতের সাক্ষী হতে, ঘুমন্ত শিশুদের চমকে জড়িয়ে ধরতে — নড়তে না — চাওয়া হাত দিয়ে। আর নীচে চা-বাগানের পেছনে মিথুন রাশির চাঁদকে দূরের বস্তিতে জ্বলতে থাকা আগুনে গোপনে মিশে যেতে দেখতে। আমাদের সমস্ত আসবাব যার উপরে বাবার নাম লেখা, উন্মুক্ত পড়েছিল অনেকদিন কামপুর স্টেশন প্ল্যাটফর্মে। বাঙালি স্টেশন মাস্টার নিহত বা পলাতক বলে রেলে বুক করা যায়নি। আবীরের বয়েমগুলো ক্লান্তিহীন ভেঙে যাচ্ছিল দিনের পর দিন।

রহস্যময় বেশি সময় লাগল দাঙ্গা থামাতে। সে দাঙ্গা কি কোনও দিন থামলো?

ভয়ের রাত থেকে বাবার হাত ধরে, আমরা গারো পাহাড়ের নীল বীজ-খামারের দিকে চলে গেলাম একদিন। মনে পড়ে মাগো?

রেলগাড়ির কু ঝিক ঝিক

ফারকাটিং স্টেশানে যখন দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় উঠে বসলাম — তুমি ফিসফিস করে বাবাকে কানে কানে বললে — "এরা ন এর আকার গ এ আকার। না গো?"

আমি তখন বাংলা বানান শিখতে শুরু করেছি তোমার কাছে। বানানটা আমি বুঝতে পারি। মুখে কিছু বলিনা। ভয়ে ভয়ে দুই সহযাত্রীকে দেখলাম। এরা তাহলে নাগা।

চা-বাগান থেকে অনেক ঘুরপথে আমরা ট্রাকে এসে বসেছি ফারকাটিং স্টেশানে। তখন রেলে তিনটে শ্রেণি। নিরাপত্তার জন্য বাবা দিতীয় শ্রেণির টিকিট কেটেছেন। না হলে আমরা তৃতীয় শ্রেণির কামরাতেই উঠতাম। থার্ড ক্লাশ। পই পই করে আমার ছোটো দুই ভাইবোনকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে — "সাবধান। রাস্তায় কথা বলবি না।"

অর্থাৎ বাংলায় বলবি না।

কিন্তু আমাদের বাঙালি পরিচয় কী করে লুকাবে মা?

তোমার শরীর তো আগাপাশতলা বাঙালি। মাথায় আধো ঘোমটা, সিঁদুর সিঁথিতে। হাতে শাখা। তোমাকে কে বাঙালি বলে চিনতে পারবে না?

আর আমাদের সহযাত্রী দুই যুবক নাগা পুরুষদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভেবেছিলে মা?

যাহোক তোমাদের দুজনের সারাপথের উৎকণ্ঠা বোঝার বয়স আমাদের হয়নি তখন। আমরা গৌহাটি স্টেশানে নামলাম। কদিন আগেও এখানে দিনরাতের কার্ফু ছিল। রেল কলোনিতে আমরা পরিচিত যে পরিবারের কোয়ার্টারে উঠলাম, তারা বিব্রত অনাহুত অতিথিদের নিয়ে।

সেই রাতে ছোটোভাইকে বড়ো বাথরুম করাতে হবে। কাউকে বিরক্ত করবে না বলে তুমি তাকে নিয়ে কোয়ার্টারের সদর দরজা খুলে নিভু নিভু হারিকেন হাতে বেরিয়েছ।

শব্দ পেয়ে হৈ হৈ করে উঠলেন গৃহকর্তা।

--- "আরে করছেন কী? নিজে মরবেন আমাদেরও মারবেন। দিনের কার্ফু উঠে গেলেও রাতে তো জারি আছে। তাও আবার আলো হাতে বেরিয়েছেন। এখুনি গুলি ছুঁড়তো মিলিটারি।"

ভাই কাঁদছে, আর তখন তোমার কোথায় পালাই অবস্থা।

কী করে যে তোমরা আমাদের নিয়ে গারো পাহাড়ের নিরাপদ গ্রামে পৌছলে — তোমরাই জানো। আগেই জানতাম ঐ গ্রামে বাংলা বলতে পারবো আমরা। এমন কি একটা বাংলা স্কুল আছে এখানে — যে স্কুলে আমি ভর্তি হবো।

নভেম্বর

যখন যেমন তখন তেমন। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। এরকমভাবে বেঁচে থাকার স্বপক্ষে আমরা নানা রকমের যুক্তি দিয়ে থাকি। নিজেদের কাপুরুষতা দুর্বলতা ঢাকতে কখনও গীতা থেকে কখনও কথামৃত থেকে ভুল উদ্ধৃতি টেনে আনি। উদ্ধৃতি হয়তো ভুল নয় — প্রয়োগ ভুল। আগাপাশতলা কাপুরুষ আমরা। এই বুঝি আমাকে মারলো, এই বুঝি অমুক অসন্তুষ্ট হলো। শুধু সমঝোতা করে বাঁচি।

আমরা যেমন একেকজন ভুল মানুষ, তেমনি একটা ভুল ভারতবর্ষে আমরা বাঁচি। প্রায়ই অসুরেরা দখল করে রাজ্যপাট। রাজা পালিয়ে বেড়ান।

তখন ১৯৮০ শেষ হয় হয়। টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রগুলোর মেরামতির কাজে ব্যস্ত থাকছি। হাতে কলমের কাজ। প্রণালীটা শুধু জানা থাকলেই হয়না, নিজের হাতে করতেও হয়। এমন সময় নতুন যুবকটি যোগ দিলো। পুরানো রাজধানী থেকে বদলি হয়ে এসেছে।

তখন কালবেলা। অনিশ্চয়তায় ছেয়ে বসে আছে ভারতবর্ষের ঈশানকোণ। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ত্রিপুরায় দাঙ্গা হলো মাস চারেক আগে। মণিপুর, নাগাপাহাড়, মিজোরামে ভারতবিদ্বেষের কালো থাবা। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আমরা অনভিপ্রেত। মুখ খুলে উচিত কথা বলার সাহসও নেই। শুধু চোখ বুঁজে দিনানিপাত। জীবিকার প্রয়োজনে টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রের সঙ্গে প্রাত্যহিক বোঝাপড়া। মানুষের মনের তল পাওয়া যায়না। কিন্তু যন্ত্র অনেক কাছের যেন।

নতুন যে যুবকটি পুরানো রাজধানী থেকে এলো — হাতেকলমে অনেক কৌশলী সে। জটিল মেরামতির কাজ যখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে করে আমরা টের পাই কীরকম ভালোবেসে কাজটা করছে সে। চারদিকের পৃথিবী ভুলে বসে আছে। কাজপাগল কুশলী যুবকটি ভদ্র ও ন্ম। তবে আমাদের যাবতীয় উদ্বেগ তাকে স্পর্শ করে বলে বোধ হয়না। মহানগরীর মাঠেঘাটে তখন উত্তেজনা। অন্য রকমের স্বাধীনতা পাগল তরুণেরা বুকের রক্তে নতুন কথা লিখছে। তাদের দমাতে প্রশাসনের কঠিন হাত সমর্থন করিনা। কিন্তু বাংলা মাতৃভাষা হওয়াতে ব্রাত্য শুধু নই — পথেঘাটে প্রয়োজনে পরিচয়টাও লুকিয়ে চলতে হয়। আমি একা থাকি। আমার মা চিঠি যাতে পোস্টকার্ডে না লিখেন জানিয়ে দিই। কিন্তু লেফাফায় অন্তর্দেশীয় পত্রে আমার নামের বাঙালি পরিচয়টা তো লুকানো যায় না। খবরের কাগজগুলো ভুল খবর, বানানো খবর ছাপিয়ে ছেলেদের আরো খেপিয়ে দেয়। আজ এখানে কাল ওখানে কিছু না কিছু ঘটছেই।

আনন্দবাজার বা কলকাতার কোনও বাংলা খবরের কাগজ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নাককাটা পুখুরীর স্টল থেকে 'দেশ' কিনে এমনভাবে বাসায় ফিরতে হয় যে কোনও নিষিদ্ধ দলিল। দেখা গেছে মোটামুটি দশবছর পরপর ব্রহ্মপুত্র ফুঁসে ওঠে। বিপন্ন হয় সত্ত্বা। পারপর আবার শান্ত হয়।

বাংলাভাষী সহকর্মীদের সঙ্গে একান্তে কথা হয়। ইঙ্গিতে ভাব বিনিময়, ভাব সম্বরণ হয়। কবে বদলাবে দিন। স্বাভাবিক হবে বাতাস আবার।

অবাক হয়ে দেখি কী নিপুণতায় ধ্যানী যুবকটি সরিয়ে রাখে নিজেকে সব উদ্বেগ থেকে। ২৯-১১-১৯৮০, আজ কিরিচ ঢুকিয়ে দেওয়া হলো আমাদের দপ্তরের দিজেন চন্দের শরীরে। ধারালো কিরিচ আমূল বিদ্ধ করলো তার হুৎপিগুকে। দপ্তরের কাজেই আরেকটি দপ্তরে যাচ্ছিল এই নির্বিরোধী শান্ত কর্মীটি। লাশ হয়ে পড়ে থাকলো একটি নালার পাশে। পুলিশ প্রায় এলোই না। না কোনও প্রতিবাদ, না কোনও সহানুভূতি। কিরিচ নিয়ে যে ঘাতকেরা দৌড়ে এসেছিল কলেজের দিক থেকে তারা নেহাত কিশোর। খুনের অর্থ তারা বোঝেনা। তবু রাষ্ট্র তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে পারে না। দ্বিজেন চন্দের অপরাধ ছিল মারাত্মক। নামের সঙ্গে সে একটি বাঙালি পদবি ব্যবহার করেছিল।

কাজকর্ম স্বাভাবিক হলেও আমরা স্বাভাবিক হইনা। তবে সব কিছু মেনে নিতে হয় কাপুরুষদের। শুধু মুখে মুখে অনেক কিছু।

সেই যুবক যে আত্মমগ্ন যাকে নিরুত্তাপ মনে হয়, তাকে একদিন কথা বলানো হলো। যা বেরিয়ে এলো তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমরা কেউই। কী উজ্জ্বল ইতিহাসের সাক্ষী ছিল এই যুবক। তার বুকের ভিতর কীরকম গভীর ক্ষত ছিল। বোঝা যায়নি আগে।

১৯৬১, মে মাস

আকাশের সূর্য দাপিয়ে শাসন করছিল তৎকালীন কাছাড় জিলা। আরো ছোটো অবয়বের শিলচর শহর তখন উদ্বেল। ভাষা আন্দোলনের অর্থ বোঝার বয়স হয়নি তখন। যুবকের বয়স তখন নয়। শুধু এটুকু জেনেছে একটা অস্তিত্বের জন্য লড়াই চলেছে। এ লড়াই হেরে গেলে চলে না। শিক্ষকমশাইরা সমর্থন করছেন। এ যেন অন্য রকমের খেলা। বাড়ির দিদি-দাদারা প্রতিদিন মিছিলে যান। পিকেটিং চলে, বালক-বালিকাদের কোনও ভূমিকা না থাকলেও তাদের আটকায় কে? আর তাকে তো আটকাবার কেউ নেই। পিতা চলে গেছেন জন্মের পরে পরেই। দিদি-দাদাদের স্নেহছায়ায় বড়ো হতে হতে পৃথিবীকে মনে হয় খেলার জায়গা। আর মে মাসের এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের জন্যই জন্ম হয়েছে তার। দিদি যাচ্ছে, দাদা যাচ্ছে। পাড়ার সবাই যাচ্ছে। বালকও গেল ১৯৬১-এর পিকেটিং-এ। সবারই লক্ষ্য শিলচর রেলওয়ে স্টেশন। একটার পর একটা রেলগাড়ি আটকে দেয়া হচ্ছে।

বালক তারাপুর নেতাজী বিদ্যাপীঠের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। আন্দোলনের বিস্তারিত তার জানার কথা নয়। নেতৃত্বে কারা আছে জানেনা। তবু তার মধ্যে সংক্রামিত এক উন্মাদনা। ভারী ভারী কথা তার জানা নেই। সে শুধু জানে একটা পূজা হচ্ছে। যেকোনোও মূল্যে রেলগাড়িগুলিকে আটকাতে হবে। স্তব্ধ করে দিতে হবে

যাবতীয় সরকারি কাজকর্ম। উঁচু শ্রেণির ছাত্ররা বলাবলি করেছে। বেশ ক'বার স্টেশান চত্বর থেকে পুলশ ধরলো। তার সঙ্গে তার খেলার সঙ্গীরা। তার সমবয়স্ক ভাগ্নেও। কিন্তু ধরলেও করবেটা কী? আটকানো যায় কি অসংখ্য দামালদের? কোনওদিন? একটু পরেই দৌড়ে এসে পড়ে স্টেশান চত্বরে। কোন্ সকালে বাড়ি থেকে কী খেয়ে বেরিয়েছিল মনে নেই। পেট চোঁ চোঁ করে ক্ষিধেয়। তবু আন্দোলনের অমোঘ আকর্ষণ টেনে নিয়ে যায় বারবার।

একসময় হৈ হউগোল। পুলিশ লাঠিচার্জ করে কাঁদানো গ্যাস ছাড়ে। পরপর গুলির আওয়াজ হয় দুপুর আড়াইটাতে। মুহূর্তে থেমে যায় সময়। লোকজনের চেঁচামেচি। দৌড়োদৌড়ি। হুড়োহুড়ি। বোঝা যায় না কিছুই। শিলচর শহর উথালপাথাল হয়। কেউ বলে সাতজন মারা গেছেন, কেউ বলে সাতাশ। কেউ বলে দু'জন ছাত্রী মারা গেছেন, কেউ বলে একজন।

সেই বালকও এলোমেলো হয়। মিছিল তারাপুর রেলওয়ে স্টেশান থেকে শহরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে আসে হাসপাতালে।

সেগুলি মিছিল ছিল? সেগুলি কি বাঁধভাঙা মানুষের ক্রোধের রূপান্তর? সেগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের ভেতরের ভাষায় বাহিরের চেহারা। মানুষের অন্তর থেকেই তার জন্ম। হাজার হাজার মানুষের বাঁধভাঙা এ মিছিল। মিছিলের পর মিছিল, তারপরও আরও মিছিল। কই ছিটকে পড়েছে তার সঙ্গীসাথীরা। এখন আর বোঝা যায়না কোন্দিকে শিলচর শহর। কোন্দিকে তারাপুর রেলওয়ে স্টেশান। সবকিছু একাকার হয়ে গেছে অদৃশ্য একটা প্রচণ্ড ঝড়ে। গ্রীম্মের আকাশ নেমে এসেছে পাকা ও কাঁচা রাস্তায়। একজন শহিদের শব নিয়ে চলেছে একটা মিছিল। নয় বছরের বালক নিজেকে আবিষ্কার করলো সেই মিছিলে। তার চোখ জ্বালা করছে। তেষ্টাও পেয়েছে খুব। হাত পা ছড়ে গেছে কখন — উত্তেজনায় টের পায়নি। মিছিলে অন্যদের দেখাদেখি তার মুষ্টিবদ্ধ হাত বারবার উপরে উঠেছে। সে জানেনা মিছিলের পুরোভাগে যে শহিদের শবদেহ বয়ে নিয়ে

যাওয়া হচ্ছে সেটা কার? কী নাম তার? দরকারও নেই। সেও তো তার মতো এক পিকেটার। হয়তো সে নিজেই।

অনন্তকাল যাবত চলছিলো কি সেই মিছিল? একসময় কেউ হাতে ধরে তাকে মিছিল থেকে বের করে নেয়।

- --- "এই এই তুই কই যাস?"
- --- "মিছিলে যাই।"
- --- "কোন্ মিছিল? কার মিছিল? কই যাবে?
- --- ''জানিনা। মিছিলে আছে শহিদের শব।''
- --- "কী নাম?"

ভাষা শহিদের ভাই

সেই বালক আজ যুবক। ১৯৮০তে গৌহাটিতে আমাদের মিতভাষী সহকর্মী যুবক যিনি না জেনে শহিদের শবদেহ নিয়ে মিছিলে কয়েক কিলোমিটার হেঁটেছিলেন — অনেক পরে তার প্রতিবেশী কাকা তাকে মিছিল থেকে টেনে বের করে জানালেন — "ও তো শহিদ নয় রে হতভাগা। ও তো তোর দিদিরে। এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলো ঐ দিদিরে। যা বাড়ি যা। কাঁদতে কাঁদতে তোর মা অজ্ঞান — দেখ গে যা।"

সেদিনের বালক আজকের যুবক, পরিচয় না জেনে তার দিদির শবদেহের মিছিলে কয়েক কিলোমিটার পথ হেঁটেছিলেন।

সহকর্মী চোখ তুলে আমাদের বললেন — "আমার শহিদ কথাই জানেন আপনারা। আর আমার আধা শহিদ দিদি? জানেন তার কথা? এক সাথেই দুই দিদি স্টেশানে গেছিলেন পিকেটিং-এ। ছোটো দিদি গেলেন শহিদ দিদিকে ডেকে আনতে। পুলিশের লাঠি আর বেয়নেটের আঘাতে আপনাদের নাম না জানা এই

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

দিদি তো চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে আছেন। শহিদ তো মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। আর ইনি যে বেঁচে থেকেও মরে আছেন।"

সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করার মতো কোনও প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসেনি। এতো বছর পর আজও — না।

এটুকুই শুধু মনে রেখেছি — যে একটি অজানা শহিদের মিছিলে হেঁটেছিল যে তার...।

অনন্তকাল যাবত চলছিলো কি সেই মিছিল? একসময় কেউ হাতে ধরে তাকে মিছিল থেকে বের করে নেয়।

- --- "এই এই তুই কই যাস?"
- --- "মিছিলে যাই।"
- --- "কোন্ মিছিল? কার মিছিল? কই যাবে?
- --- "জানিনা। মিছিলে আছে শহিদের শব।"
- --- "কী নাম?"

ছোটগল্প

উদ্ধার

নকুল রায়



বিজয়াদশমীর রাত বারোটা-সাড়ে বারোটা। দূর থেকে তখনো শোনা যাচ্ছিল প্রতিমা বিসর্জনের কর্কশ কোলাহল। দশমীঘাটের সমস্ত প্রতিমার 'শবদেহ' ভেসে চলছে পশ্চিম বাঁকে। হাওড়া নদীর ওপর ব্রীজ, এক ফার্লং দূরেই দশমীঘাট। আধা-আলোঅন্ধকারে, কাছিমের পিঠের মতো ভেসে আছে জওহর ব্রীজটি। তার তলা থেকে স্নানের শব্দ ভেসে আসছে। বিসর্জনকারীদের শেষ দলটিও চলে যাচ্ছে। আগরতলা শহর যেন রণক্লান্ত অথবা ব্যথাতুর।

দশমীঘাটের পূর্বপান্তে মহাশাশান। কে যেনো চেঁচিয়ে বললে — 'ভালা দিন্অই মরছে'। অদূরে, চিতা জ্বলছে একটা চুল্লিতে। ছায়ার মতো শববাহকেরা এদিকওদিক নড়ে-চড়ে হাঁটছে। কেউ আগুনটা উস্কে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে দুয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়া। দশমীঘাট বাঁধের ওপর উঠে, সোজা পশ্চিমদিকে কিছুটা গিয়ে আবার বাঁকা মোড় নিয়ে ময়াল সাপের মতো চলে গেছে ইটের পথটি রাজনগর গ্রামের দিকে। অধিকাংশ দিন-মজুর, হতদরিদ্র ছেঁড়া তোষকের সব মানুষ তুলোর মতো উড়তে উড়তে, এই রাজনগর নদীর চরে বসবাস করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে থেকে গেলো। শুধু থাকলো না, বছরের পর বছর ধরে, নদীর চরে, নদীর বুক থেকে মাটি তুলে উঁচু ভিটে বানিয়ে, বাঁশের খুঁটি লাগিয়ে ফেললো প্রায় আধ মাইল জুড়ে। ছিন্নমূলেরা এভাবেই এক জায়গায় জমা হয় আস্তে আস্তে। এদের সমাজ হয়। নামও হয় একটা, চরায় লোক। চর-বাসিন্দে। এইরকম চর-বাসিন্দের দুয়েকটা সংসারের কথা আমি আজ আপনাদের শোনাতে চাই, যাদের অতীত এখন ম্লান, বর্তমান ভঙ্গুর আর ভবিষ্যতের সীমা কতদূর তাদের জন্যে ফলপ্রসূ, আমার জানা নেই।

২

বুক চাপড়ে, এক বৃদ্ধ ৫৫ থেকে ৬০ হবে হয়তো বয়েস, যাকে গৌরাঙ্গদা বলে সবাই ডাকে, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, তার খুঁট-প্রান্তভাগ দুপায়ের নিচে গলে পেছনের দিকে চলে গেছে, জল-মাটি-কাদায় একাকার বৃদ্ধের শরীর, দীর্ঘ পাতলা শরীরটা ঝুঁকে পড়ছে, সকালের দিকে তার হাফ সার্টটির রং ছিলো আকাশি, এখন কাদা ছাড়া কোন রং নেই, মুখ গোল ভাঙা, চোখ দুটো খুবই ছোট হতে হতে বোতামের মতো হয়ে গেছে, মুখের ভেতরটা বিশাল হাঁ নিয়ে চিৎকার করে গাইতে গাইতে চলেছে—

'আমি ডাকি মা মা
মায়তো কানে শুনে না
ছাইড়া যাইতে পরানডারে
কী দিয়া তুই বান্দলি তারে,
কইয়া যা না একবার আইয়্যা
অই অবলা..."

বৃদ্ধের উদাত্ত প্যাথোজ, ঘর-বাড়ির প্রতিটি জানলা দরজায় যেন আছড়ে পড়ছে। ৪-৫টা বালক জল-কাদা মাখা, তার পিছু পিছু অতি নিঃশব্দে বিহুল হয়ে ছায়াপথের মতো হেঁটে-থেমে, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে, বৃদ্ধের পিছু চলতেও থাকে।

বৃদ্ধ পড়ে যেতেই, বাচ্চাগুলি হুমড়ি খেয়ে পড়লো বৃদ্ধের পাশে। কান্নায় ভেঙে পড়া ছোট ছোট হাতে অতি আদরে শ্রদ্ধায় মেশানোতে উঠিয়ে বসলো।

বৃদ্ধ ওদের কোলে নিয়ে এবার সত্যি সত্যি নিমুস্বরে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

9

জনৈক একনিষ্ঠ সাংবাদিকের ডায়েরি থেকেঃ

বিষয়টা যখন আমি নামধামসহখবরের কাগজে পরপর দু'দিন প্রকাশ করে ফেলি, তৃতীয় দিন সকালের দিকে বলতে গেলে আমি ভয়ংকর এক মৃত্যুর মুখোমুখি হই।

প্রথমে ঘুম ভাঙে দরজা ভাঙার শব্দে। ডান দিকের শিয়রের পাশে গ্রীল দেয়া জানালা ফাঁক হয়ে একটি শাবল ঢুকে পড়ে। টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হয়েছে।

কী করবো, আগেই দরজার পাল্লা ভেঙে পড়ে গেলো ভেতরে, প্রায় আমার পায়ের কাছে।

গোটা পাঁচেক তরূণ। প্রত্যেকের হাতে কিছু না কিছু অস্ত্র। সামনের মোটা মতোন বয়েস ২৫-২৬র ছেলেটির শরীরে একটি খয়েরি গেঞ্জি। ব্রাউন রঙের প্যান্ট। স্থানীয়র'দের একজন। তার ছবিটাই কাগজে দিয়েছি। আসল কালপ্রিট।

-- শুয়োরের বাচ্চা! তুই সাংবাদিক না? আমরা রাজনগরের মুকুটহীন সম্রাট, আর শালা তুই আমার পেছনে লাগছিস!

আমি কিছুই শুনতে পেলাম না। প্রচণ্ডভাবে মার যে খেয়েছি তা সাত দিন বাদে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে টের পেয়েছি।

8

রাজনগর গ্রামের চর-বাসিন্দে গৌরাঙ্গ সরকারের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। রোজগার বলতে বসে ঠোঙা বানানো, কম দরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাগজ কেনা। আরেকটি রোজগার, যে রোজগারে তার মাসাধিককাল চলে যায়, তার নিজস্ব চিন্তার ফসল, সেটা হলো প্রতিবছর দশমীঘাটে জলে নেমে বিসর্জনের প্রতিমার কাপড়চোপড় সংগ্রহ করা, প্রতিমার অস্ত্র-শস্ত্র অক্ষত অবস্থায় এনে পরে রং করে খেলনা হিসেবে সেগুলি বিক্রি করা কোন মেলায়-টেলায়, আর বাঁশের কাঠামোও কাঠ সংগ্রহ করা। বাঁশগুলো জ্বালানো ও ঘরের মেরামতি চলে। কাপড়-চোপড় ধোলাই করে এমন নতুন করা হয় যে, সেগুলি প্রতিমা-সাজার দোকানে কম দামে বিক্রি করা যায়, ধুতিটুতি নিজের ব্যবহারে লাগে।

গৌরাঙ্গ সরকারের দুই মেয়ে, নিজে ও স্ত্রী — এই নিয়ে সংসার। বড় মেয়ের নাম দুর্গা। অবিকল দুর্গার মুখ। ফর্সা এবং নাক-চোখ ঠোঁট ও দাঁত এসবের যদি যত্ন করতে পারতো, আর ৫ম শ্রেণীতে না হয়ে কলেজের ছাত্রী হতো, আমার মনে হয় রাজনগর কেন, গোটা শহরে এমন সুন্দরী কমই পাওয়া যেত। তার মনটা খুব উদার, খুব কম কথা বলতে অভ্যন্ত। ঘরের কাজ এবং বাবার সঙ্গে বসে মায়ের হাত ধরে ধরে ঠোঙা বানানোটা তার দৈনিক কাজ।

দুবছরের ছোট বোন একা। সে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে নিজের বাড়ির কাছেই এক বালোয়ারি স্কুলে পড়ায়। বড় বোনের মতো এমন শারীরিক সৌন্দর্য তার নেই, বরং শরীরের রং একটু শ্যামলা, একটু খাটো, কিন্তু মানানসই; সবচেয়ে বড় কথা, তার কণ্ঠস্বরে এমন এক জাদু আছে যে নাটকের উপযুক্ত গলা মনে হয়। যাকে দেখলাম না কিন্তু তার কণ্ঠস্বর চিনি, তেমন। একার সঙ্গে ঘটনাচক্রে পরিচয়। একদিন;

- -- ভেতরে আসতে পারি? খবরের কাগজের অফিস, সন্ধের দিকে সে এসেছিলো।
- -- বসুন।
- -- আমাকে একটা উপকার করবেন? আমি রাজনগরে থাকি। আপনি তো জয়নগরে, কাছেই।

তার দিকে তাকালাম। মেটাবলিক সাউন্ড। কণ্ঠস্বরে এমন ব্যক্তিত্ব, স্পষ্ট দ্বিধাহীন বাচনভঙ্গি আমাকে আকৃষ্ট করে।

দুকাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বললাম, চা খাবেন তো?

--- হ্যাঁ। খাবো।

মেয়েটি যা বলেছিলো, তা পুরোটা এখানে বলবো না কিন্তু আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে, কিছুদিনের মধ্যেই একা কিংবা একার বোন আক্রান্ত হতে পারে। একজন নেতা গোছের গুন্ডা যার দৌরাত্যে চর-বাসিন্দেরা ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। একটি মারুতি আর গোটা চারেক শিষ্য নিয়ে সে বাংলাদেশে যুবতি পাচার করে। বাংলাদেশ থেকে মিড্ল-ইম্টে সেই যুবতিরা ক্রমপর্যায়ে বিক্রি হতে হতে একসময় ত্রিপুরা নামক রাজ্য থেকে তাদের নামই মুছে যায়।

এর মধ্যে দুবার তার থাবা বিস্তার করার সুযোগ খুঁজেছে। সুতরাং আমাকে ব্যবস্থা নিতেই হলো। খোঁজ খবর নিলাম। তার ফটো তুললাম গোপনে। তার গাড়ি ও সাকরেদদের বাই দ্য রেকর্ড করলাম, আর লক্ষ্য রাখলাম কোন এলিবাই হাত-ছাড়া হয়ে যায় কিনা।

ক্রমশ একার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হলো আমার। গোটা পরিবারটা আমার নিজস্ব ভুবন মনে হলো। আমি ভয়ংকর রকমের ঝুঁকি নিয়ে চললাম।

সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলে নিলাম। তিনি জানালেন এগিয়ে যেতে। পুলিশের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলি, কারণ ঘটনাটা আমাকে শেষপর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে চলছিলো। আমি নেশাগ্রস্ত বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। জানি এটা হিন্দি সিনেমার ফিক্সান নয়, আমাকে বাস্তবিক মৃত্যুর দূতের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

ঠোঙাতে আঠা লাগাতে ব্যস্ত দুর্গা। সন্ধেবেলায় একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাশের বাড়ির একটি বাচ্চা এসে খবর দিলো, 'দিদি তুমারে ডাকতাছে'।

- -- কেডা রে?
- -- চিনি না। তুমি আইতা, একটা মাইয়া লুক ডাকতাছে।

দুর্গা একটা ন্যাকড়ায় হাতের আঙুল মুছে বাইরে আসে। একা, ওদের বাবা ও মা পাশের বাড়িতে একটা অনুষ্ঠানে গেছে। দুর্গা ভাবলো সেই বাড়ির কেউ। বাইরে, অন্ধকার ঠেলে চার কদম যেতেই — দেখে, মারুতির ভেতর থেকে বেরিয়ে সেই গুন্ডা দলবল সহ তার দিকে দৌড়ে আসছে। দুর্গার গলা বসে যায়। এমনিতেই তার কণ্ঠস্বর কোমল। সে দৌড়ে চলে গেলো অনুষ্ঠান বাড়িতে। সেখানে আলোর ঝলকানিতে পড়ে সামনেই পেয়ে গেল পাড়ার এক কিশোরকে। তার কাছে গিয়ে ভেঙে পড়লো সে।

ঘটনাটি আর এগোয় নি। মারুতি চলে গেল। পরদিন একার মুখে সব শুনলাম।

- -- তোমাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে আমি ব্যবস্থা নেবো। একা আঙুলে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে।
 - -- কী ব্যবস্থা?
 - -- গুলি করে মেরে ফেলো।

-- এটা সিনেমা নয়, আবেগের প্রশ্ন নয়। আমি নিজেই শেষ করে দিতে পারি, সে ব্যবস্থা ও সাহস আমার আছে। কিন্তু এর পরে তো বাঁচতে হবে। কাজেই, আরেকটু সময়, আমি তাকে জালে আটকাবো।

বিজয়াদশমীর বিকেল থেকেই চার-পাঁচটা চরের শিশু ও কিশোর নিয়ে, গৌরাঙ্গ আবার দশমীঘাটে হাজির। প্রতিমা তখনো বিসর্জনে আসছে না, শুধু পাড়ার ছোটদের বানানো দেড় হাত বাই চার হাতের কাঠামো বিসর্জন করে ওরা নাচতে নাচতে চলে গেলো। গৌরাঙ্গদের কেউ ওদিকে গেলো না, শুধু তার বাচ্চা শিষ্যরা হাততালি দিয়ে 'দুগ্গা মাই কি, জয়'। বলে উল্লাস দেখালো।

- -- কাহা, মূর্তি আইতাছে মন্অ হয়। কিশোরটি দূরে আঙুল তুলে দেখালো।
- -- আইওক্, তরা রেডি অইয়া থাক। এইবার নাকি কাডাম বাড়ছে শুনলাম। গৌরাঙ্গ তৃপ্তির সঙ্গে ঢোক গিলে, কাঁধের গামছাটা কোমরে বেঁধে একটা বিড়ি ধরায়।
- -- আম্রাও শুনতাছি। একশ চল্লিশটা। গতবার আছিল একশ কুরিডা। হঠাৎ তার কথা ডুবে গেলো। রাজ আমল থেকেই বিসর্জনের মিছিলের প্রথম দুর্গা প্রতিমা থাকবে স্থানীয় দুর্গাবাড়ির প্রতিমা। ব্যান্ড বাজিয়ে, সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত বাদ্যকর প্রতিমার সামনে বাজাতে বাজাতে শহর পরিক্রমা করে দশমীঘাটে এল। বাজির শব্দ ও ব্যান্ডপার্টির কোরাসে, বাদ্যযন্ত্র-সুর আকাশেবাতাসে ভেসে যাচ্ছিলো। গোটা দশমীঘাটে তখন হাজার হাজার মানুষের প্রোত। বিসর্জনের এমন দৃশ্য আগরতলা শহরে আর কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। আবালবৃদ্ধবনিতার স্রোতের তোড়ে দুর্গা প্রতিমা হাওড়ার জলে ধরাধরি করে নামানো হল গাড়ি থেকে।

দুর্গাবাড়ির মূল প্রতিমা মন্দিরেই থাকে। শুধু প্রতিবছর নতুন মূর্তি প্রতিমা বানিয়ে পুজা করা হয়। অষ্টমীতে মোষ বলি দেওয়া হয়। এই রীতি এখনো আছে।

আমি একার সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছি। দুর্গা আমার বাঁহাতের কনুইয়ের সঙ্গেই আছে। সামনে উত্তাল হাওড়ার জল। জলের তলের বালিতে শ্রোতের বালিতে পা ডুবিয়ে, কখন সাঁতরে একটার একটা প্রতিমার শরীর খুলে নেংটো করে, পোশাক-আশাক খুলে চলছে গৌরাঙ্গ ও তার শিষ্যরা। প্রচুর মানুষ তখন জলে। শতাধিক মানুষের জটলা, ঢাকের আওয়াজ, শত শত ঢাকি বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে চলছে।

কোনো শব্দ কানে কানে বললেও ভালো শোনা যায়না। হঠাৎ হঠাৎ বলতে হয় কাউকে কিছু। হঠাৎ নীরবতার ফাঁক গুনতে হয়।

গৌরাঙ্গ মাঝ নদীতে চলে যায়, যেখানে ডুবজলের গভীরতা। সেখানে ডুব দিয়ে জলের তলা থেকে টেনে তুলে, বাচ্চাদের সাহায্যে সে হাঁটু জলের কাছে নিয়ে আসে কাঠামোগুলি, কাঠামোর বাঁশ কাঠ জড়ো করে সোজা শুকনো জায়গায় একটু দূরে সাজিয়ে রাখছে একটি বাচ্চা। সে পাহারা দিচ্ছে, আবার জলে ঝাঁপও দিচ্ছে।

গৌরাঙ্গ প্রতিমার অস্ত্র-শস্ত্রগুলি জড়ো করে প্রতিমার কাপড়েই পুঁটলি বেঁধে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে জমানো স্তূপে।

আমি ক্যামেরা নিয়ে জলে নামলাম। কারণ খুব কাছ থেকে প্রতিমার বিসর্জনের পেথোজ থাকলে তা তুলে নেবো। প্রচণ্ড হৈহৈ-ভেতর কেউ কোথাও নেই। আমি বেপরোয়া হয়ে পড়লাম। যখন যে-কাজটি করি একমুখিতার স্লোত আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

হাওড়ার দক্ষিণ পাড়ের বসতবাড়ি গাছগুলিতে দিনের আলোর মতোন সার্চলাইট পড়েছে। আর ছোট ছোট পাখিগুলি তাদের আশ্রয় ছেড়ে আলোর মধ্যে যেন উড়ছে আর শব্দের বান ছড়াচ্ছে। এমন রাতের নিসর্গে পাখিরা আমাকে উদাস করে দিল।

কিশোরটি মাঝ নদীতে কোমর পর্যন্ত নেমে একটি কাঠামো ছুঁতে যেতেই পায়ের কাছে আরেকটি কাঠামো পেলো। কিন্তু সে পা দিয়ে ছুঁয়ে বুঝলো প্রতিমার কাপড়ে পা জড়িয়ে গেছে।

- -- ও কাহা, ইহানে সিঙ্গেল আছে গো। কিশোরটির কথাটার অর্থ হলো, প্রতিমাটি আলাদা।
- -- তুই খুইল্যা নে। আমি ডুব দিব ইহানে। খুডিটা আটকাইয়া গেছে বালুতে। গৌরাঙ্গ মুখ খিঁচিয়ে তাকে বলে।

কিশোরটি জলের নিচে কাপড় খুলছে কোমর থেকে। এবং অনায়াসে। সে অবচেতনেই অবাক হলো। প্রতিমার পা উরু যৌনাঙ্গে পা লাগিয়ে তার ব্লাউজ খুলছে, ব্লাউজ খুলে স্তনে দুই হাত দিয়ে চেপে ধরতেই সে লাফ মেরে ওঠে। কাপড়-চোপড় পুঁটলি করে, সাঁতরে মাঝ নদীতে গিয়ে গৌরাঙ্গকে বলে — 'কাহা ইডা মানুষ গো, মূর্তি না'।

গৌরাঙ্গ টানা-হ্যাঁচড়া করে বহু কষ্টে কাঠামোর বাঁশটি সরালো। তারপর নিচথেকে দেবী দুর্গার কাপড় খুলতে পেরে যেন, এতক্ষণ পরে তার মুখে হাসিফুটলো। বললে, 'আইতাছি, তুই যা'।

গৌরাঙ্গ এলো। বহু পুণ্যার্থীর জলের ছিটায় ধাক্কায় ওরা দূরে সরে যায়, আবার আসে। বাচ্চাগুলিকে ডাকলো গৌরাঙ্গ। ওরা চারটা শিশু একটা কিশোর মিলে, জলের তলা থেকে নগ্ন প্রতিমাটি জলের ওপর তুলে ধরল।

-- ভাতিজারে, ইডা দেহি দুগ্গারে! আম্রার দুগ্গমা মা-রে, কেডা হেরে মারলোরে এএএ হেহেহে...'

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

এরপর আর কোন দৃশ্য নেই। কোন শব্দ নেই। চতুর্দিকে এত কোলাহল, এত উল্লাস এত আলোকোজ্জ্বল পাখি, ছড়ানো ঢাকের আওয়াজ, কোন কিছুই গৌরাঙ্গকে বিদ্ধ করতে পারলো না।

চারটে শিশু, একটি কিশোর ও একজন অক্ষম পিতার ক্রন্দনে কোন ঈশ্বর এগিয়ে এলো না।

ছোটগল্প

ইচ্ছে আখ্যান বৈদূর্য্য সরকার



পাঁচমাথার মোড় দৌড়ে ক্রস করতে গিয়ে সুজন লক্ষ্য করলো — এর'ম ক্রসিংয়ের সামনে থেকে ছিটকে বেরোয় বাইক আরোহীর দল, অশ্বারোহী সৈনিকের মতো হুড়মুড় করে। উপমাটায় অবশ্য ওর নিজেরই হাসি পেল। ওকে এজন্যেই নীলাঞ্জনা বলতো "তুই মাইথোলজিতেই আটকে রইলি"। কথাটা মনে পড়তে বেশ আনমনা হয়ে গেল সুজন। সেই ভ্যাবলা অবস্থাতেই ঢুকে পড়লো হরিদাস মোদকের দোকানে। এরা এখনও টেবিলে কলাপাতা পেতে দেয়। লুচি তরকারি আর ছানার জিলিপি সুজনের মনে হল — কেন যে লোকে পিৎজা প্যাটিসের পেছনে কয়েকশো টাকা খরচ করে কে জানে! এইতো দিব্যি পঞ্চাশ টাকায় রাতের খাওয়া হয়ে গেল। রাতটা ট্রেনে দিব্যি কেটে যাবে। কলকাতা স্টেশনের দিকে রওনা দিল, কাল সকালে বারাউনি পৌঁছতে হবে।

সবসময়েই তাই করে ও। বিহার ঝাড়খণ্ডে গিয়ে লিট্টি খায়। মনে আছে, প্রথম ঘিয়ের লিট্টি খেয়ে একেবারে আক্কেলগুড়ুম অবস্থা হয়েছিল। যদিও কলকাতার কাউকে সেকথা বোঝানো যায় না। সুজনের আশ্চর্য লাগে, এখানকার লোকেরা যে কী যুক্তিতে এখনও উন্নাসিকতা বজায় রেখেছে কে জানে। একলা থাকলে ও নিজের মনে বিড়বিড় করে — এই করেই কম্যুনিটিটা শেষ হয়ে গেল। বড় বড় সরকারি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ও দেখেছে আধিকারিকরা হয় বিহারি নয়তো রাজস্থানি বা সাউথ ইন্ডিয়ান। ও অনেকের মুখে শুনেছে, ''আগেকার সেই দাসবাবু বা ব্যানার্জীসাহেবের সময় আর নেই''। তা সত্ত্বেও ইন্টার্ন ইন্ডিয়ার বেশ কিছু লোকের মনে এখনও কলকাতা সম্বন্ধে বেশ উচ্চ ধারণা। যদিও সেটা কলকাতায় থাকা লোকেদের মধ্যে তেমন নেই। এখানে সবাই জন্ম থেকেই শেখে — হয় বিদেশ কিংবা ব্যাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ না যেতে পারলে জীবন ব্যর্থ। সুজন লক্ষ্য করেছিল, বাঙালি কলকাতার বাইরে থাকলে যত সহজে বাঙালিত্ব ঝেড়ে ফেলে দেয়, অবাঙালিরা কিন্তু তত সহজে বাঙালি হয় না। তারা তাদের পারিবারিক স্ট্রাকচার মেনটেন করে শেষপর্যন্ত।

ট্রেনে উঠে এসব ভাবতে ভাবতে নিজের মনে হাসছিল সুজন। অন্তত তার মুখে এসব কথাবার্তা একদমই মানায় না। একটু বড় হওয়ার পর থেকে অজান্তেই সে সামাজিক জীবন অ্যাভয়েড করে চলেছে। বাবা মা'র বাইরে অন্য আত্মীয়স্বজনদের সাথে পারতপক্ষে যোগাযোগ রাখে না। সবার সম্পর্কেই খানিকটা তাচ্ছিল্যভাব আছে ওর — 'কেউ কিছুই বোঝে না'। কেউ জানেই না ও কিভাবে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে ভোররাতে বাড়ি ফেরে, কখনও জায়গা না পেয়ে বাসের মাথায় মাঝরাতে হুহু হাওয়ার মধ্যে নট নড়নচড়ন হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়। তবু এই সময়গুলোতে ওর তেমন অভাববোধ হয় না, সবসময়েই দেখে বেশ কিছু লোক ওর মতো অবস্থাতেই আছে। তারাও ওর মতো নিশ্চিত নয় — প্ল্যাটফর্মে রাত কাটাতে হবে নাকি আস্তানায় ফিরতে পারবে। রাতের দুনিয়ার সম্ভবত কোনও কুহক মায়া আছে। গভীর নেশার মতো তাতে সবাই বিভোর হয়ে থাকে।

সে মায়া সুজন সম্যক বুঝেছিল একবার টাটায়। সেবার বাধ্য হয়ে একটা ছোট হোটেলে রাত কাটাতে হয়েছিল। হোটেলটার একটা ফ্লোরে ও একা থাকার জন্যই বোধহয় প্রথম থেকেই একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। রাত বাড়ার সাথে নিঝুম হয়ে যাওয়া চারপাশে আশ্চর্যভাবে জেগে উঠলো হাঁটাচলার শব্দ, খেয়াল করে সুজন বুঝল শব্দটা ওর আশপাশেই। বিরক্ত হয়ে আলো জ্বেলে দেখলো — ওর জুতোটা চলার মতো ভঙ্গিতে ঘরের মাঝমধ্যিখানে পড়ে আছে। ভয়টয় নয়, ওর মনে হয়েছিল — দিনরাত এত হাঁটাহাঁটি, সে অভ্যেসেই হয়তো জুতোটা একা একা হেঁটে ফেলেছে। অন্য কেউ হলে যেখানে ভয়ে মরতো, ও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল তারপর।

২

বহুবারের মতো আজ একা ট্রেনে যাওয়ার সময় সুজনের মনে হতে লাগলো

— সবাই এসব শুনে বলে, প্রভূত সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও ওর জীবনটা হয়েছে 'না
ঘরকা না ঘাটকা'! বাকিদের সাথে মিলেমিশে থেকে নিশ্চিন্ত কোনও চাকরি
করতে পারে না, আবার যে কাজটা করে — এই যাযাবরের জীবনেও আর পেরে
উঠছে না শারীরিকভাবে । যদিও ও ছোট থেকেই বাঙালির আবহমান ভ্যাদভ্যাদে
জীবনকে অপছন্দ করে এসেছে। তাই কলেজজীবন থেকে অ্যাডমায়ার করা
ফ্র্যামবয়েন্ট জীবনের প্রতি টান এতদিনেও কাটলো না ওর। লোকে শুনে অবাক
হয় —ভোরে রাঁচি থেকে ফিরে হাওড়া স্টেশনে বাথক্রম সেরে কারেন্ট টিকিট
কেটে সুজনকে অনেকসময়েই রওনা হতে হয়েছে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে।

ইস্ট জোনের বিভিন্ন ফ্যাক্টারিতে ওদের কোম্পানির বসানো ইন্সট্রুমেন্টের মেন্টেনেন্সের দায়িত্ব ওর। অতিরিক্ত হিসেবে নর্থ-ইস্টের কিছু জায়গা। মাঝে মাঝে মনে হয়, রাজাবাজার থেকে পাশ করার আগে দুনিয়াটাকে এমনভাবে ভাবেনি ও। তখন ছিল খানিকটা স্বপ্নময় দিন, চারপাশে প্রিয়ার সুবাস। প্রথমে সে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠতা। এখন সে অতীত

এক্সট্রা লার্জ হয়ে সুজনের স্বপ্নে ফিরে ফিরে আসে। একা একা কোথাও গেলেই যেন বেশি করে মনে পড়ে পুরনো সব কথা।

সেসব কথা যে এতটা অভাববোধ তৈরি করবে তখন মনে হতো না। কেননা তখন নিজের বেঁচে থাকাটাই ছিল বেশ রোমাঞ্চের। শরীরে নানারকম খিদে। ঘরের বাইরে চোরা টান। পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রির সময় সকালবিকেল বিভিন্ন প্রান্তে টিউশানির দৌড়দৌড়ির মধ্যে কিভাবে যেন এসে পড়েছিল নীলাঞ্জনা। কয়েক মুহূর্তের দেখাতেই মিটে যেত সব চাহিদা। সুজন ওর নামটা ছোট করে বলতো নীলা। শুনে নীলাঞ্জনা বলতো, "জানিস নীলা সবার সয় না"। তখন ও কলেজ শেষ করে কি একটা ছোটখাটো কাজ করে। তাতে অবশ্য সুজনের কোনও আগ্রহ ছিল না।

পরিচিত বন্ধুমহলে সুজন বেশ জনপ্রিয় ছিল। কারণটা ছিল বাকপটুতা, যেকোনও লোককে ও অকাট্য যুক্তির জালে ফাঁসিয়ে দিতে পারতো। ওর মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত ভাব ছিল যে, কালে কেউকেটা কিছু একটা হবে। কিন্তু তার মধ্যেই নীলাকে হারাতে হল। অসহ্য রাগ হয়েছিল ওর, মারাত্মক একটা কষ্ট। যদিও তখন কিছু করতে পারবে না জানতো। কোনওক্রমে একটা চাকরি পেয়েছে — সেটার ভরসায় সংসার পাতা যায় না। নীলাকে ব্লক করেছিল, ওর ফোন ধরতো না। কেননা নীলার মেসেজ বা পোস্ট দেখে মনে হত — ওকে বিদ্রূপ করার জন্যই এসব। বুঝতে চাইতো না, নীলার কোনও উপায় নেই। ওর বাবা আগেই মারা গেছিল। আর কৈশোরের এর'ম কতশত প্রেম যে পরিণতি পাবে না — সেটাই তো স্বাভাবিক। সেকথা ও স্বীকার করতে চাইতো না। যদিও নীলার চলে যাওয়ার সময়েও কারোর কাছে কিছু বলেনি, পুরোটাই চেপে রেখেছিল নিজের ভেতর।

সেটাই ওর কাছে স্থায়ী হয়ে আছে - কেননা ঠিক ওইরকম কোনও মেয়ে আর চোখে পড়ে না, মনে ধরে না। তাই সবকিছু সত্ত্বেও ইদানীং ওর মনে হয় — সেসময়ের সবটাই বোধহয় শক্তিক্ষয় ছিল। ছোটখাটো পত্রিকায় লেখা ওর গলপগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। গিটারটাও পাশের পাড়ার একটা ছেলেকে বেঁচে দিয়েছিল আগেই। সাইকেলটাও স্ক্র্যাপ হয়ে গেছে। সুজনের শখ বলতে টিকে ছিল বিভিন্ন দেশের ফিল্ম দেখা - ডাউনলোড করে কিংবা সিডি কিনে। নিজেকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গলেপ বিভিন্ন চরিত্রে কল্পনা করতো সুজন। এখন ওর স্থির হয়ে বসার কোনও উপায় নেই তাই ইচ্ছেরাও শুকিয়ে যাচ্ছে। এখন কিছুই মনে থাকে না। ক্রমশ সিম্টেম তাকে গিলে ফেলছে। ভাবনাচিন্তার শক্তি হারিয়ে ফেলছে, পড়াশোনার বদলে শ্টিরিওটাইপ কাজকর্মে অভ্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে মনে হয় প্রাচীন কোনও সেনাবাহিনীর ঘোড়সওয়ার দলের লোক, যাদের কাজ একটাই —অনন্ত ছুটে চলা।

9

সেদিন সকালে পৌঁছে থেকে নানারকম কাজ। সেটআপে একটা মেজর ফল্ট। সম্বে সাতটা পর্যন্ত অনেক কষ্টে ব্যাপারটা ম্যানেজ দিল ও। তারপর আর শরীর বইছিল না। বেশি খোঁজাখুঁজি না করে, যে হোটেলে বরাবর থাকে সেখানে এসে চেনা লোকটাকে দেখতে পেল না। তার জায়গায় পাতলা চেহারার একটা ছেলে। ছেলেটার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে বেশ বিরক্ত লাগলো ওর। তাই ঠিকমতো কোনও জবাব দিল না। বরং মাথার মধ্যে কি যেন একটা হল, বলে বসল — "একজনকে খুঁজতে এসেছি ... সে এখানেই কোথাও আছে"। ছেলেটা রান্নাঘরে থাকা কারো সাথে পরামর্শ করে এসে ওকে ঘর খুলে দিল।

চান সেরে ঘরে বসে সুজন যখন বিয়ার খাচ্ছিল ছেলেটা ঘরে এসে ওকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো আর আশ্চর্যজনকভাবে ওর বানানো উত্তরগুলোয় সে বেশ কনভিন্সড হয়ে যাচ্ছিল। সুজন বলল — ''নীলা নামের একটা মেয়েকে ও খুঁজতে এসেছে। ও খবর পেয়েছে এখানেই কোথাও সে লুকিয়ে আছে একজনের সাথে''। বলতে বলতে সুজন খেয়াল করলো ছেলেটা বেশ চোখ বড় করে শুনছে, হয়তো পুরো এলাকা জুড়ে এর'ম কাউকে দেখেছে কিনা মনে করার চেষ্টা করছে। তবে ওর এসব বানানো এলোমেলো কথা বিশ্বাস

করছে বলে ছেলেটার প্রতি কেমন কৃতজ্ঞতা হচ্ছিল সুজনের। সে ছেলেটাকে আধ বোতল বিয়ার দিয়ে ফেলল।

তখনও বুঝতে পারেনি ছেলেটার কৃতজ্ঞতাবোধ কতটা ভয়ানক। যখন বুঝতে পারলো তখন বেশ টলটলে অবস্থা সুজনের। খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারের মধ্যে শুনতে পেল তলার ফ্লোর থেকে বেশ একটা প্রাণঘাতী আর্তনাদ। দ্রুত নীচে নেমে এসে শুনতে পেল গোঙানি ও কান্না মেশানো একটা মেয়ের গলা। খেয়াল করে বুঝলো দেহাতি হিন্দিতে মেয়েটা কাউকে শাপশাপান্ত করছে। কিছুটা এগিয়ে বুঝলো হোটেলের ছেলেটার কাণ্ড এটা। সম্ভবত তার বউকে মারধোর করছে। বিরক্তিলাগলেও ব্যাপারটা ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলো না সুজন। খানিকটা এগিয়ে দেখলো মাটিতে পড়ে মেয়েটা চিৎকার করছে আর ছেলেটা একটা ভুল করে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

ওদের কথা কানে একটু সয়ে গেলে সুজন যা শুনলো — চমকে ওঠার মতোই ব্যাপার। মেয়েটা এই হোটেলের আগের লোকটার বউ। এই ছেলেটা যে করেই হোক লোকটাকে যে শুধু ভাগিয়ে দিয়েছে তাই নয় - একেও ভুলিয়ে এনেছে। প্রণয়ঘটিত ব্যাপার সোসাইটির এই লেয়ারে এর'মই ঘটে জানতো সুজন কিন্তু এটা জানতো না ওর বানানো কথার সূত্রে এদের জীবনে কি অশান্তি নেমে আসতে পারে। ছেলেটা সুজনের কথার অস্পষ্ট ইঙ্গিতে ভেবেছে ওদের ব্যাপারটাতেই সুজন খোঁজ করতে এসেছে। তাই ছেলেটা ওর প্রেয়সীকে হারানোর ভয়ে সব ফেলে এখান থেকে আজ রাতেই পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক মেয়েটা বাধা দেওয়ায় এই বচসা। শুনে সুজনের বেশ অপরাধবোধ হতে লাগলো, তার থেকেও নিজের ওপর খানিকটা অনুশোচনা হতে লাগলো — ও কোনোদিনও নীলার জন্য কি এর'ম কিছু করতে পারতো!

কিছুটা কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলো ছেলেটার কনফিউশান হয়েছে — নীলা নামটাতেই। অদ্ভুত ব্যাপার এই মেয়েটার নাম - নীলু। কে জানতো, এখানে

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

মেয়েদের নাম নীলু হয়! ওর জড়ানো জিভের উচ্চারণে নীলাকে এই ছেলেটার নীলু শোনা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু ওকে যে কেউ এর'ম দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ভাবতে পারে, সে বোধটাই ছিল না সুজনের।

ওদের যে কোনও ভয় নেই — এটা বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হল সুজনক। বেশি ঝামেলায় না গিয়ে সুজন ওদের বলল, "ও অন্য একজনকে খুঁজছে"। তারপর নিজের ঘরে এসে নির্ঘুম রাতটা কাটিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে পড়ল। ভোরের ট্রেনে বাড়ি ফেরার সময় সুজনের বারবার মনে হচ্ছিল — 'কোন গল্প যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়, কে রাখে তার হদিস'।

ছোটগল্প

নষ্ট বীজের প্রভু সদানন্দ সিংহ



দুপুরের অলস ঘুম অলসতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। আর সেই ঘুম যদি বিকেল পর্যন্ত গড়িয়ে যায়, তাহলে শরীরটা বিগড়ে যাওয়া মেসিনের মতো হয়ে যায়। কোনও সিস্টেমিটি বজায় থাকে না। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক-একটা দেশের মতো হয়ে যায়। এমনই এক অবস্থার মধ্যে সামন্ত বিছানায় ভয়ে ভয়ে একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ প্রথমে ভনতে পায়। তারপর সে দেখে ঘরে রাখা পত্রিকার কাগজ, চিঠি, টুকরো কাগজ, পলিথিনের পাতলা ব্যাগ ইত্যাদি সব ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল। তারপর এক প্রচন্ড হাওয়া এসে ঘরের অনেক কিছু লওভও করে দেয়। জলের প্লাস্টিকের জগটাকে নিচে ফেলে দেয়। ঘরটা জলে ভয়ে যায়। কাচের ফুলদানিটা নিচে পড়ে ভেঙে যায়। ফুলদানির প্লাস্টিকের ফুলগুলি কোথায় কোথা জানি ছিটকে পড়ে। ঘরের ঝুলিয়ে রাখা কাপড় চোপড় পাগলের মতো এলোমেলো উড়তে থাকে। তখনই সামন্ত বুঝতে পারে তার ঘরের ভেতরে একটা প্রচন্ড ঝড় পাঁক খাচ্ছে। প্রথমে সে ঝড়ের

মাত্রাটা বোঝার চেষ্টা করে শুয়ে শুয়েই। তার চুল, লুঙ্গি সব সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একবার ভাবে — দেখি ঝড়টা একটু কমে কিনা। এইসব চিন্তার মাঝেই সে দেখে ঝড়টা জানালা দিয়ে কোথায় জানি সরে যাচ্ছে। কিছু কাগজের টুকরোও ঝড়ের সাথে উড়ে চলে যায়। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সামন্ত। ঝড়টা একদম চলে গেলে সামন্ত দেয়াল ঘড়িটা দেখে, সাড়ে চারটা বেজে গেছে। এই রে, রুনার আপিস ছুটির সময় হয়ে এল যে। সামন্ত বিছানা থেকে তড়াক করে নেমে দাঁড়ায়। খালি গা ওর। লুঙ্গিটা কষে গিঁট দেয়। তারপর ভাঙা ফুলদানির ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে একটা পুরনো পত্রিকার ওপর রাখতে থাকে। কুড়োনো শেষ হলে সে কাচের টুকরোগুলোকে পত্রিকাটা দিয়ে মুড়ে খাটের নিচে রেখে দেয়। সে দেখে, ফুলদানির প্লাস্টিকের ফুলগুলো ঘরের এদিক ওদিক পড়ে আছে। সেগুলিকে সে কুড়িয়ে এনে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রাখে। তারপর একটা ন্যাকড়া আর বালতি এনে ঘরের মেঝে থেকে জল পরিষ্কার করতে থাকে। মেঝের জল পরিষ্কার করার পর বালতি এবং ন্যাকড়াটাকে আগের জায়গায় রাখতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। একটু পরে ঘরে ঢুকে এলোমেলো সমস্ত কাপড়গুলি গুছিয়ে রাখার পর ছিটিয়ে থাকা কাগজ, ম্যাগাজিন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র গোছায়। তারপর বিছানাটা ঝেড়ে সাজাবার পর ঝাড়ু মেরে ঘরটা পরিষ্কার করে। শেষে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধোয়। গামছা দিয়ে জল মোছে। তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে মুখে এবং শরীরে একটু পাউডার মেখে চুল আঁচড়িয়ে নিয়ে গায়ের ওপর একটা সাদা পাঞ্জাবি চাপিয়ে দেয়। সবকিছু ফিটফাট থাকলে রুনার মনটা খুশিতে একটু ভরপুর থাকে।

সামন্ত আবার ঘড়ি দেখে। পাঁচটা বেজে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রুনা এসে পড়বে। রুনার আসার সময় হিলের জুতোর একটা খটখট শব্দ হবে। ঐ শব্দ শুনে সামন্ত চোখ বুজেই বলে দিতে পারে কে আসছে। সামন্ত জানালার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে চায়। আকাশটা এখন পরিক্ষার। আকাশের দিক থেকে সে এবার তার দৃষ্টি রাস্তার দিকে ঘোরায়। এই সময়েই সে দেখে ভটভট শব্দ করতে করতে একটা মোটর সাইকেল ছুটে এসে হঠাৎ রাস্তায় থেমে গেছে। ওটার চালকের পেছনে রুনাকে দেখে সে একটু চমকে যায়। বাইক থেকে নেমে চালকটির সঙ্গে রুনা হেসে কিছু কথাবার্তা বলে। সে কথবার্তা সে শুনতে পায় না দূর থেকে। তারপর সে দেখে ভটভট করতে করতে মোটর সাইকেলটা চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে রুনাও দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

ক্লান্ত মুখে রুনা গটগট করে ঘরে চলে আসে। তারপর শাড়ি পাল্টিয়ে বাথরুমে ঢুকে যায়। সামন্ত জানে বাথরুম থেকে বেরুতে রুনার প্রায় আধঘন্টার মতো সময় লাগবে। বেরিয়েই সে চা খেতে চাইবে। সামন্তই চা করে প্রতিদিন। শুধু চা কেন, বাজার করা থেকে শুরু করে রান্নাবান্না সহ ঘরের সমস্ত কাজই সামন্ত করে থাকে। দশ বছর যাবৎ এভাবেই চলে আসছে। বেকার মানুষ সে, ঘর সামলানোর কাজটা সে স্বেচ্ছায় নিয়েছে। বহু চেষ্টা করেও আর্টসের গ্র্যাজুয়েট সামন্তর চাকরি আর হয়নি। বিয়ের আগেই অবশ্য রুনার চাকরি হয়ে গেছিল ক্লার্ক গ্রেড পরীক্ষায় পাস করে। ভালোবাসার বিয়ে তাদের। একসময় সামন্ত ছিল রুনার গৃহশিক্ষক। ধীরে ধীরে ভালবাসা গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে।

চানঘরে রুনার গুনগুন গান শোনা যাচছে। আজ সামন্তর কিছুই ভালো লাগছে না। চা করতে ইচ্ছে হয় না আর। মোটর সাইকেল চালকটির কথা তার মনে বারবার ভেসে আসতে থাকে। লোকটার মুখটা হেলমেটে ঢাকা ছিল। আর রুনাও লোকটার পেছনে প্রায় গায়ে লেগেই বসে ছিল। কে লোকটা ? রুনা লোকটার সঙ্গে যেভাবে হেসে কথা বলছিল, সেভাবে অনেকদিন তার সঙ্গে কথা বলে না। সামন্ত ভীষণ চিন্তায় পড়ে যায়। কপালের রগ বেয়ে টপটপ ঘাম ঝরে।

ক্রনা বাথক্রম থেকে বেরিয়ে এসে দেখে সামন্ত ঝিম মেরে বিছানার এক কোণে বসে রয়েছে। তাদের ঘর একটাই। এখানেই শোবার ঘর, বসার ঘর এবং খাওয়ার ঘর। রায়াঘরটা অবশ্য আলাদা। তবু ঘর ভাড়া মেটাতে ক্রনার বেতনের বেশ একটা অংশ খরচ হয়ে যায়। সামন্তের দিকে তাকিয়ে ক্রনা বলে, চা কই?

- -- করিনি। ভালো লাগছে না।
- -- আচ্ছা ঠিক আছে। আমিই করছি।

কলা রান্নাঘরে ঢুকে যায়। সামন্ত একটা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে মন বসাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বারবার হেলিমেটে ঢাকা একটা মুখ তার সামনে ভেসে উঠতে থাকে। তার কাছে সব কিছুই বিস্বাদ মনে হতে থাকে। ঐ হেলেমেটে ঢাকা লোকটা তার বন্ধু নিশ্চয়ই নয়। হয়তো শক্রই। কত নাম্বার শক্র তা অবশ্য সে জানেনা। ইদানীং তার শক্র-সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। রিটায়ার্ড গভর্গমেন্ট অফিসার গজেন্দ্রবাবুও বর্তমানে তার একজন শক্র। দেখা হলেই তাকে অনবরত জ্ঞান দিয়ে চলেন যেন সে দুগ্ধ-শিশু। পাড়ারই কিছু চ্যাংড়া ছেলে তার এখন এক নাম্বার শক্র। তাকে দেখলেই ওরা বলাবলি করে, কনাদির বৌ। একবার তো সে রাগে চ্যাংড়া ছেলেগুলোর সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, এসব কী ইয়ার্কি হচ্ছে। তাকে ঐ অবস্থায় দেখে একটা ছেলে জবাব দিয়েছিল, আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছি আর ইনি এসেছেন আমাদের কাছে জবাব চাইতে। যান যান মশাই, আপনার কাজে যান। সামন্ত চুপচাপ চলে এসেছিলো। পরে ঘটনাটা শুনে কনা বলেছিল, অন্য পাড়াতে বাড়ি পাল্টাতে হবে। আর শোনো, তুমি কিন্তু ঐ অসভ্য ছেলেগুলোর সামনে আর যেয়ো না।

ক্রনার পরামর্শ মানার চেষ্টা করেছে সে। চ্যাংড়া এড়িয়ে চলাফেরা করে সে। তবু ওরা তাকে দূর থেকে দেখলে বলে ওঠে, ঐ দেখ্, রুনাদির বৌ যাচ্ছে।

রুনা দুহাতে দু কাপ চা নিয়ে ঢোকে। এক কাপ চা সামন্তের দিকে বাড়িয়ে দেয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সামন্ত চায়ের কাপ নেয়। ম্যাগাজিনের দিকে যেন গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে সামন্ত। কোনও কথা বলেনা। কিন্তু বলার সুযোগ খোঁজে।

চেয়ারে বসে রুনা চায়ে চুমুক দেয়, তারপর বলে ওঠে, দিনের পর দিন এক ধরনের জীবন আমার আর ভালো লাগেনা। বৈচিত্র্য নেই এক্টুকুও।

সুযোগ পেয়ে সামন্ত বলে বসে, কী ধরনের জীবন চাও তুমি? বাঁধনহারা জীবন?

সামন্তের দিকে চেয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করে রুনা বলে, আমি কিন্তু চেয়েছিলাম বন্ধনযুক্ত জীবন। একটামাত্র সন্তান এলে মনে হয় আমাদের জীবনটা স্বর্গের মতো লাগতো।

সামন্ত ফস করে বলে ওঠে, সন্তান এলেই যে স্বর্গের মতো লাগবে তার কোন মানে নেই। আর সেজন্যও আমি দায়ী নই। ডাক্তারি পরীক্ষায় আমার কোনও ক্রিটি ধরা পড়েনি।

রুনাও জবাব দেয়, সে তো ডাক্তার আমাকেও রিপোর্ট দিয়েছে, আমারও কোন ত্রুটি নেই।

- -- তাহলে দোষটা কার? আমার নয়।
- ্র –– দোষ তোমারই। কারণ–কারণ তুমি হচ্ছ নষ্ট বীজের প্রভু।
- -- আমি নষ্ট বীজের প্রভু! তাহলে তুমি কী? তুমি হচ্ছ একটা অনুর্বর জমি। মরুদ্যানহীন মরুভূমি।
- -- নষ্ট বীজের প্রভুর কাছে মরুভূমিই বা কি, পলিমাটিই বা কি! সবই সমান। মূল্যহীন।
- -- ঠিক বলেছ। তোমার কাছে আমি এখন মূল্যহীনই। তাই তোমার কাছে আমি এখন নষ্ট বীজের প্রভু ছাড়া আর কিছই নয়। এভাবে থাকতে আমারও

ভালো লাগে না। সত্যিই আমি একদিন চলে যাব, যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে। দরকারে মুটেগিরি করব, ভিক্ষে করব। এভাবে জীবনটা কাটাতে আমার অসহ্য লাগছে। বলতে বলতে সামন্ত টের পায় তার মাথার ভেতরটাতে একটা ভীষণ উত্তাপ ঘুরপাক খাচ্ছে।

-- বেশ হয় তুমি যদি চলে যাও। কবে যাবে? বলতে বলতে রুনা হঠাৎ হাতের চায়ের কাপটা ডাইনিং টেবিলের ওপর রেখে সামন্তের কাছে উঠে আসে। সামন্তের তখন রাগে এবং অপমানে চোখে জল প্রায় আসছে। রুনা হঠাৎ সামন্তের পেছনে বসে পেছন দিক থেকে সামন্তকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে বলে, তুমি যখন চলে যাবে, তখন আমিও তোমার সঙ্গে যাব। খুব মজা হবে।

সামন্ত একটু অবাক হয়। রুনাকে এক রহস্যময়ীর মতো লাগে। রুনা যেন এক রহস্যময়ী নারী, যার অবগুণ্ঠন সামন্ত হয়তো কোনোদিনই খুলতে পারবে না। রুনার গাল সামন্তের গালে এসে লাগে। সামন্ত রুনাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তবু তার সব রাগ আস্তে আস্তে জল হতে থাকে। রুনার কিশোরীর মতো উচ্ছাসটুকু দেখে তার খুব ভালো লাগে এখন। আর তখনই তার চোখের সামনে হেলমেটে ঢাকা একটা মুখ আবার ভেসে ওঠে। সে চোখ বুজে ফেলে। চোখ বুজতেই সে স্পষ্ট দেখে একটা মোটর সাইকেল গর্জন করতে করতে ছুটে এসে তাকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। লোকটা কি রুনার কলিগৃং নাকি কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুং কে লোকটা ? সামন্ত কিন্তু কিছুই প্রশ্ন করে না রুনাকে। ভবিষ্যতেও কোনোদিন করবে না। রুনার ইচ্ছে হলে নিজে এসে বলুক।

ছোটগল্প



সংকৈত বিজয়া দেব

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে যে লোকটা তাকে দেখে চমকে উঠলাম। মুখে একরাশ শুকনো দাড়ি, মাথায় লম্বা হয়ে যাওয়া একরাশ চুল, চোখদুটো প্রখর, তেজি। দীর্ঘদিন অযত্নে যাপিত জীবন এমনটা হয়ে থাকে। আমার ভয় করে উঠল।
-- আপনার বাড়িতে একটু আশ্রয় চাই।

মানে ? কোথাকার লোক, চেনা নেই, জানা নেই। পাগল হবে নিশ্চিত।

-- আমার কোনও ঠাঁই নেই কোথাও। নিরাশ্রয়ের কষ্ট বোঝেন ? বেশ, একটু বসতে দেবেন ? দুটো কথা ত বলা যায় ?

বলে লোকটা ঘরে যে ঢুকেই পড়ল! এই ভর সন্ধ্যেবেলা, ঘরের ভেতর জড়ো হওয়া অস্পষ্ট আধার...লোকটি জাঁকিয়ে বসেছে সোফায়। এই অচেনা লোকটি আমার ঘরে ঢুকেই পড়ল , কীভাবে ? মানে ঢুকতে পারল আমি দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম বলেই, না হলে ও ঢুকতে পারবে কেন ? কিন্তু কেন ঢুকতে দিলাম ? এই তো দিন চারেক আগে এ শহরেই এক বাড়িতে এক বৃদ্ধা মহিলা খুন হয়েছেন। তাছাড়া, চুরি হছছে খুব। এই ত পাশের গলিতে দিনদুপুরে চুরি হয়ে গেল। চুরি না বলে ডাকাতি বলাই ভাল। দিনে চুরি মানে ত ডাকাতি। এই লোকটা যদি দরজাটা লাগিয়ে দেয়! খুব জোরে আমার শ্বাসনালী চেপে ধরে! যদি ...

- -- আচ্ছা, দেবতাদের কোনও কষ্ট নেই, কি বলেন ? আমি ফের চমকিত।
- একগ্লাস জল খাওয়াবেন ? ফ্রিজে পুরনো মিষ্টি ফিস্টি আছে ? এখন বাড়িতে কেউ নেই। মিমি স্যারের বাড়ি, টিউশানিতে। সুজন অফিস থেকে ফেরার পথে মিমিকে নিয়ে আসবে। তবু কিসের অশেষ টানে আমি একগ্লাস জল, মিষ্টি ও বিস্কুট প্লেটে সাজিয়ে লোকটার সামনে রাখলাম কে জানে! আমার মনে হচ্ছে এসব কাজ আমি নিজে করছি মোটেই তা নয়, কেউ যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে।
- বুঝলেন, আজকাল দিনরাত দেবতাদের নিয়ে ভাবি। স্বর্গরাজ্য, আহা ! জ্যোৎস্নার মত সারাক্ষণ পেলব আলো, খিদে, তৃষ্ণা সব মিটিয়ে দিচ্ছে অমৃত। পারিজাত কুসুম ফুটে আছে থরে থরে ...অপ্সরা নৃত্য করছে ...সুখ সুখ ঢালাও অপরিমেয় সুখ। জন্ম নেই জরা নেই মৃত্যু নেই ...কত ভাগ্য হলে যে ভগবান হওয়া যায়!

লোকটি জল খেল, এমন জল খাওয়ার ধরনও কখনও দেখি নি, যেন ভষে নিল। এবার বিস্কৃট খাচ্ছে ...ধীরে ধীরে...

- -- সত্যি কি ভগবান আছে ? নাকি কুঁচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ চুলের মত ব্যাপার ? -- বলে একটু জ্র কুঁচকে তর্জনি তুলে বলে,
- -- আছে আছে। ভগবান আছে। খুব মজাতেই আছে। মেঘবরণ চুল নিয়ে কুঁচবরণ কন্যা ত আছেই।
- এবার লোকটি মিষ্টিগুলো দাঁতে কাটছে। দাঁতগুলো সরু, ইঁদুরের মত ছুঁচলো।
- -- বুঝলেন, আমি জেলে ছিলাম। আজ জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। বেরিয়েই সোজা এখানে। অনেকদিন পর বরাকনদী দেখলাম। কী নদী, বাব্বা! একেবারে রূপের রানি।
- -- জেলে ? জেলে কেন ? আমি আঁতকে উঠেছি।
- না না, খুনটুন করিনি। ভয় পাবেন না। নৌকোতে করে যেন ভেসে ভেসে এসেছিলাম, ওপার থেকে এপারে। কবে এসেছিলাম মনে করতে পারি না। এ জন্মে, নাকি পূর্বজন্মে ?
- -- ওপারে মানে ?
- -- ওপারে গো। বাড়ি ছিল সুরমা নদীর পারে / দমকা একটা ঝড় আসিয়া রে / ভাইঙ্গা নিল তারে ...। মাছভরা পুকুর, গোলাভরা ধান ... ইতিহাস বটে, ত সেই দোষেই জেলে গেলাম।
- -- ছাড়া পেলেন কি করে ?
- -- ছাড়া পেয়েছি ? পাই নি ত! এই যে হাতপায়ে বেড়ি। লোকটা নিজের হাত পা দেখায়।
- -- অনেক বয়েস আমার। একশ' পেরিয়েছে কবে!
- -- একশ ?
- -- তাই হবে। বুঝুন, গাছপাথর আছে কি বয়েসের ? আরও বেশি হতেও পারে। যতদিন চন্দ্রসূর্য ততদিন আমি। যতদিন আলোবাতাস ততদিন আমি। এই দেখুন,

আমি ঐ গানটা জানি ...পদ্মার ঢেউ রে / মোর শূন্য হৃদয়পদ্ম দিয়ে যা ...যা রে ... আবার এটাও জানি , ওরে বরাক নদী , তুই যে রূপের রানি / তোর রূপ দেখে মোর মন ভরে যায় / হারাই যে পরাণী / ওরে বরাক নদী ...তবে নদী বড় নিষ্ঠুর গো, বলে তুই সুরমা গাঙ্গের মানুষ, সে যে আমার বিমাতার মেয়ে ...এখানে তোর ঠাঁই নেই ...

এখন সুজন ও মিমি এসে ঢুকল। এই লোকটির নোংরা পোশাক, তার জ্বলন্ত চোখ, তার উস্কো চুল, তার চড়া সুরে ভাটিয়ালি ...সুজন থমকে দাঁড়িয়েছে। লোকটা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

মিমির কাঁপা গলা -- কে গো মা ? তুমি বুঝি চেনো ?

কি বলব বুঝে পাই না। লোকটি জ্বলন্ত চোখে সুজন ও মিমিকে দেখে। তারপর বেগে বেরিয়ে যায়। আমি দরজায় ছুটে যাই। কেউ নেই কোথাও। একরাশ আঁধার রহস্যের মত পড়ে আছে। সুজন বলছে -- কে এই লোকটা ? চেনো তুমি ?

ভেতর থেকে কেউ বলে -- হ্যাঁ, অনেকদিনের চেনা।
মুখে বলি -- কি জানি!

তৈমুর খানের তিনটি কবিতা



সাফল্য

চারপাশ থেকে বিসায় ছুটে আসছে প্রেমে পড়ার অভিনয় করে মাতৃ করে দিচ্ছি শহর

সবাই রস ঢেলে দিচ্ছে আমাকে হাবুডুবু করতলে রসিক নাগর হয়ে করে যাচ্ছি টইটম্বুর দিনপাত

খুব দামি জিনিসও সস্তায় পেয়ে যাচ্ছি ঘরদোর কলসি কলসি ভরে নিচ্ছি বিলাস পলিথিন প্যাকেটেও পাচার করছি সম্মান সাফল্য দেখতে তুমিও আসবে নাকি ? তাহলে নির্মোক খুলে বসব নিরালায় শব্দের পৌরুষে তোমাকেও করে নেব জয়

কাজলদিঘি

এখানেই আছি যেমন থাকা যায়
কাজলদিঘির পাড়ে অথিতি আমি
একান্ত কুঁড়ে ঘরে
জলে নামলে জোছনার রাধা
আমি তার ছায়া কুড়িয়ে পাই

খুব যদি ভুল হয়, শূন্যতার পরিধি জুড়ে নিঃসঙ্গ চতুর ঘোড়া আসে আমি তার জ্রর ধনুকে বাক্য বসাই বাক্যে কোমল চাঁদ, শব্দে বিনয় আমি তাকে ঢেকে রাখি অলীক মায়ায়

পড়শি বিকেল থেকে চেয়ে আনি খই কী সুন্দর রাঙা তার ভেতরের ঘুম অথবা ঘুমের ডাঙা চর্চিত সন্ধ্যায়

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

শ্রীরাধা নূপুর খুলে তরঙ্গ পার হয় যত দেখি কাজলদিঘি নাচে চোখের তারায়

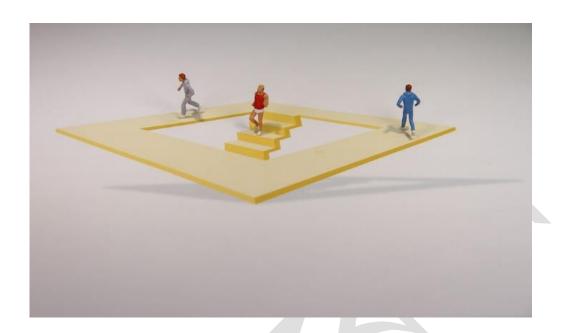
এ বাড়ি পৃথিবীর বাড়ি

একবার কি আসবে না ?
এ বাড়ি আমার বাড়ি নয়
এ বাড়ি পৃথিবীর বাড়ি
এ বাড়িতে ঈশ্বর থাকেন
ঈশ্বর বড়ো নির্জন

তোমাকেই দেহ খুলে দেবো সমস্ত পরাগগুলি নিয়ে যাবে তুমি আগামীর পৃথিবীতে পরাগে পরাগে ফিরে আসবে নতুন সন্তান

আসতে পারো, আমি ও ঈশ্বর এক বাড়িতেই থাকি পৃথিবী কোনওদিন আমাদের উদ্বাস্তু ভাবে না

কবিতা



বিজ্ঞাপন দিশারী মুখোপাধ্যায়

শিরীষপাতা কাকে বলে জানিয়েছিলাম কাকে বলে জাম পাতা

তোমার উঠোনের হাজার পাওয়ারের বাতিটা যার ফিলামেন্ট কেটে গিয়েছিলো সেটা কি আবার তার বাকশক্তি ফিরে পেল

আমার আজকাল কালির দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লিখতে ইচ্ছে করে কিংবা আর্টেক্স-এর ফাউন্টেনপেন

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

সুলেখা এখন বিলুপ্ত কথন তাহোক, তবু আমার স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে

এখন বাজারে সর্ট-ঝুলের জামার খুব চল জোড়াসাঁকোর ভদ্রলোক যে জোব্বাটা পড়তেন সেইটা কিনবার জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে এই লেখাটি আমার একটি কিডনি বিক্রির বিজ্ঞাপন

শিরীষপাতার পাঠ শেষ হলে ফার্ণ

কবিতা



নিজের মুখোমুখি ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

কত কথা বলে যায় প্রবল বাতাসমনে হয় রোদ্দুর দেখেনি কখনো সে
যে আবদ্ধ ছিল এক পাতার কুটিরে;
প্রতিদিন বয়ে যেত এলোমেলো হাওয়া
বৃষ্টিও ঝরে যেত পাতার ওপর
এমনই ছিদ্রহীন ছিল বনাঞ্চল।

দেখিনি যদিও কোন অদ্ভুত চলন;

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

তবু তার হুঙ্কার ছুঁয়ে যেত মন, তবু তার হাহাকার আমার জীবন, তবু তার উল্লাস আমার মরণ।

এইবার মুখোমুখি হয়েছি তাহার, কেটে গেছে জীবনের অনেক সময়, এইবার আমি আর উন্মুক্ত সে একসঙ্গে হেঁটে যাই জীবনের পথ।

কবিতা



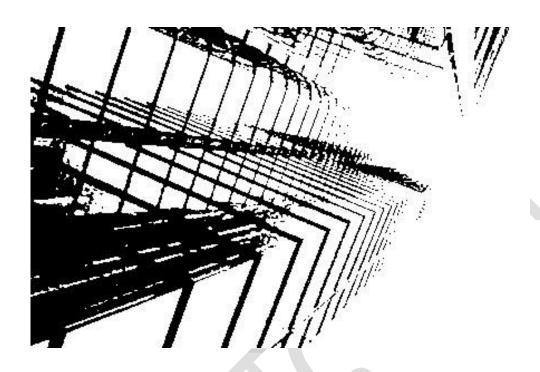
হাওয়ার ভাষায় সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আহত চিতার মত, আলোয় পিছলে যায় পার্ক স্ট্রিট
ম্যাগনোলিয়ার দরজা ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে আসে
নিরুদ্দেশ মোনিকা চৌহান, সিগারেট ধরায়...
কলকাতা নামে, কোনো শহর কি ছিল কখনো কোথাও ?
চিঠি আর টেলিফোন, ইমেল আর চলভাষ
কোথাও পৌঁছোয়না, আলোর বুদ্বুদে চোখে অন্ধকার নামে
ভালোবাসা, সেই কবে কোভালাম বিচে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি কখনো

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রিয় মুখ, জটিল মানচিত্র হয়ে গেলে, মনে হয়
বড় বেশি অপচয় হয়েছে সময়...
হাইরাইজ অনুবাদ করতে গিয়ে
যে ছেলেটি জ্যোৎস্লায় ভেসে যাওয়া অরণ্য হয়ে গেছে আজ
পাঁচ-দশ বছর পর, সে তোমার দরজায় বেল দেবে ঠিক একদিন
কথা হবে, হাওয়ার ভাষায়...

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের কবিতা



অন্ধকারের কবিতা

নিয়ে আছে সর্বাঙ্গ

١.

কাল রাতে জোছনায় পুড়ে গেছে একলা বকুল ঘাসের কান্নায় মিশে আছে সূর্যের শোক বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীরা শাঁখ কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেলে নির্জনের সাথে পাড়া ভাব করে নেয় অন্ধকার পাতায় শুধু ম্লান বাতাসিয়া অক্ষর ২ গন্ধের ভিতরে আদিম রাত্রি আসে তার শরীরে কোনো সুললিত গান নেই শুধু কিছু বিড়ালি চাল আর উৎকট উল্লাস নিয়ন আলোর

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

কেঁপে ওঠে সাদা বনতল অন্ধ বেদনায় মৃত শিশ্মের কাছে রজনী নামাই অবাক ফেটে ফেটে যায় রেখার স্লায়ুদেশ

৩. পূর্ণমিদম

খোলা আকাশের নীচে ভালো হচ্ছে অসুখের কাগজ বৃষ্টির জল পেয়ে। ঔষধের নাম ধুয়ে গেলে এক্কা গাড়ি ছুটে মাঠে দেখে কাঠবিড়ালির ডিগবাজি

বাজিগরের অদ্ভূত খেলায় সংলাপ বন্ধ। ধরতে গেলেই পাল্টে যায়। মেয়ে পুরুষ আর পুরুষ মেয়ে। এবার বাঁশি অসি হয়ে মাভৈ

ভৈরবী রাতের এলোকেশী রূপ শশ্মান জাগালে চাঁদ ফেরে না। না-লোভ মহাসুখ ডাকে পঞ্চস্কন্ন জ্বালিয়ে আর পরমে নীরব উৎসব

শব হলে সব পাওয়া আর শান্তি অশান্তি প্রলাপের শেষ 8.

পথ চাওয়াতেই আনন্দ

ঘামের লবণ জলে স্নান করতে করতে পেরিয়ে এলাম চন্ডীতলা আর বুড়ো বটতলা মানুষেরা গল্প করছে আর সেই আড্ডার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তায় এখানে লুঙ্গি ধৃতির বিতর্ক নেই পুকুরের একধারে কাপড় তুলে জল ত্যাগ করছে রমণী আর কিছু দূরে একটি মেয়ে কুকুর ঘিরে আরো কয়েকটা পুরুষ পুরুষত্ব ফলাতে ব্যস্ত ফলাহার শেষে পেপে পাতা চিবুচ্ছে শাখামূগেরা শরৎকাল এসে গেছে বলে তুমিও খানিক খড়গুঁজে দাঁড়িয়ে আটচালায় চালাঘরের পাশে গোবরের স্থূপ দেয়াল চিত্রে তরুণ এর কাঁধে আদিম অস্ত্র হরিণ নিশ্চিত বসে পদমূলে কোথাও যেন কোনো হিংসা নেই একটা দৃশ্য থেকে আরেকটা দৃশ্যতে সে তৈরি করে ফেলল একটা সেতু আমাদের রোগা না হয়ে আর উপায় নেই

(}.

শিরোনামহীন

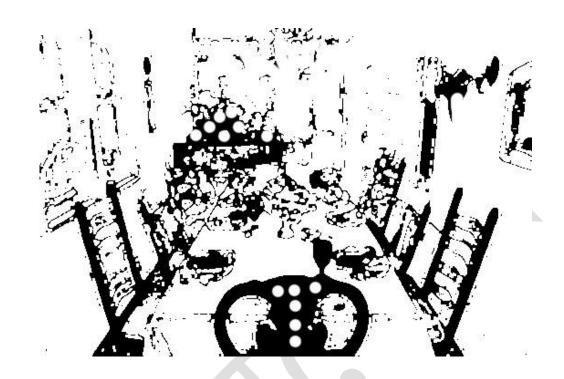
এই শূন্যমাঠ শোক আর গীতা নিয়ে শিশির কুড়িয়ে কোথায় থমকে

হস্তাক্ষর খোঁজে ধূলোর শরীরে সরে যায় মৃত পাখির থেকে হাত

পৌষের চাঁদমনা সন্ধ্যায় বৃষ্টি এলে আত্মজীবনীতে অসমাপ্ত রেখা

কিছু শব্দ রেখে ট্রেন চলে গেলে ঈশ্বর একা প্ল্যাটফর্মে....

প্রণব বসুরায়ের কবিতা



যাপন চিত্ৰ

কিছু কথা, যা রক্তে লেখার... নিরীহ কলম কি বোঝে সে বেদনা!

ফল জানে শুধু খসে পড়তেই নাড়ি-ছেঁড়া ক্ষত বুঝি তাহাতে পৌঁছোয়?

আমি তার জানি না কিছুই...

আমাদের ত্যক্ত ডানায়

নিকটে নয়, এখানে গরু তরু রাম ও রহিম ছায়া নেই, আদিগন্ত ধূ ধূ বালির সাগর, নেই স্নান কাঁটা গাছে ভরেছে নার্সারী, আর সব ফল শিশুপ্রিয় নরম রবারের... অক্ষর সাজানোর খেলা শেষ হলে চলে যাব তমিস্রার দিকে উটে চেপে...

আমাদের ত্যক্ত ডানায় লেগে যাবে হিম যুগ, বরফের কুচি

কবিতা



রাংতা বানু তনিমা হাজরা

উঁচু দাঁত, ট্যাপা নাক, দীঘল দুটি চোখ, বয়েস তেরো কি চোদ্দ, কিংবা পনেরোও হতি পারে,

গরীবগুর্বোর ঘরে ছেলেপিলের বয়েসের হিসেব থাকে না। সেই যে বচ্ছর বান ডেকেছিল খুব কিংবা ধান মোটে ফলেনি কো এভাবে হিসেব চলে।

তা যাইহোক মাবাপখাওয়া অনাথ মেয়েটিকে নিয়ে বেলডাঙ্গার পঞ্চানন এসে দাঁইড়েছেল লেকভিউ রোডের সান্যালবাবুদের লনে। ঘরের ফাইফরমাশ খাটার জন্যি একটি কাজের লোক চাই। পইপই করে শিখিয়ে এনেছিল পঞ্চা, জাত জিগাইলে কইবি, হিঁদু, চাষা, সদগোপ।

সেই ইস্তক রাংতাবানু হিঁদু হইছে। নোক্ষীনারাণের ঘরে সোনঝে পিদিম দেয়, ভূলেও আল্লারে আর একবারটিও ডাকেনিকো।

বাবুদের পেল্লাই ঘর, হাজার মানুষের যাতায়াত,

সেজ দিদিমুনির পুরানো ফরক আর ছুটকি দিদির ইজের পরে রাংতা বেড়ে ওঠে পুকুরের শাপলার মতো।

এসোজন বসোজন কালে ভদ্রে দুদশটাকা বোকশিশও গুঁজে দিয়ে যায় হাতে, আর দুচারজন নোলা চোখ আড়ালে আবডালে হাত দেবারও চেষ্টা চালায় তার বুকে বা পাছায়,

তা বাড়ন্ত বয়সের কোঠায় এসব এটু আধটু অঘটন হতিই পারে, এইসব খুশি বা আক্রোশ রাংতা সবকিছু তুলে রাখে বুকের খাঁচায়। একে একে সব দাদাবাবু দিদিমণিদের বে হতি থাকে, চাকুরী জীবিকার টানে টানে সব বিদেশ বিভূঁই চলে যায়।

রাংতার তো মাবাপ নেই, তাই তার বে হতি নেই।

সে ভাদোরের রোদে সেঁকে রাখে তোষক, বালিশ, আলোয়ান, সোয়েটার। মুছে রাখে ফার্নিচার, দামি দামি সেরামিক বাসন কোসন, চোখ ফেটে পড়ে যাওয়া অবাধ্য জল।

সেই যে কবে যেন এসেছিল কোন এক যুগে গ্রামতুতো চাচার হাত ধরে, ভাতের দায়ে চুপিচুপি আজান ভুলেছে, ভুলেছে রমজান, এখন সে নবগ্রহস্তোত্র আউড়ায়, সুর করে গায় মীরার ভজন গান। ধুপদীপ জ্বালে চিলেকোঠার ঠাকুর ঘরে রোজ সন্ধ্যায়।

বাবামশায় চলি গেলেন দুবছর আগে, মাঠান গেলেন গত বর্ষায়। পাশে তাহাদের ছিল রাংতাই একা। দাক্তারবিদ্যি, ওষুধ, হাসপাতাল। বাকি সব যারা উপদেশ দেয় ফোনে, নামমাত্র দেখতে আসে বা দুদিন থেকে ফিরে যায় যে যার ঠিকানায়।

চার মহলা বাড়িটায় এখন রাংতাবানু একা। বয়স তার ষাটের কোঠায়। চোখে ছানি, চুলে রূপার ঝিলিক।

আজ সকালে ফাইনাল মিটিন বসিছে হলঘরে। এ ঘর নাকি বেচা হবে। বাকি ব্যাংকের কাগজপত্তোর, মাঠানের গহনাগাটি, পিতল-কাঁসা-রূপার বাসন কোসন আর যাবৎ কিছু সম্পত্তির চুলচেরা ভাগ হবে পাঁচভাইবোনে।

ওগো, শুনতিছো, তোমরা কে নেবে গো রাংতাবানুরে?

চুলচেরা ভাগাভাগি, চেঁচামেচি, কথার গায়ে কথাদের চাপানউতার রাংতার ক্ষীণ গলা কারো কানেতে না পৌঁছায়।

কবিতা



অশালীন তমা বর্মণ

সমস্ত বসন্তরাত্রি পার হয়ে লাল রঙের জটিল সমাচারগুলি লিখি

একটা সরল দিন বা রাত্রির কথা ভেবেছিলাম, অশান্ত লাল-রঙে দুঃখ বাঁধিয়ে তোমার নিবিড় বন্ধুত্বে স্বস্তি পাবো ভেবেছিলাম, এমন অনেক কিছুই আমরা এলেবেলে ভাবি ভাবি, লাল রঙ বড়ো নিষ্ঠুর তীব্র প্রতিবাদ অশালীন লাল রঙ বড়ো ভারাতুর শান্ত

বাকি যে ব্যথারা মুখোশের কঠিন রঙ
সে রঙে আজ তোমার সঙ্গে সামান্য
রাগ অভিমান, পারো যদি ছলনা ভুলে
গাঢ় কোনো মায়াবী সুতো দিও,
একটু আধটু বোঝাপড়া সঙ্গে বেঁধে নিলে
ভালো ---- বিষয় ভালোবাসায়

আমার জন্ম মৃত্যুর রঙ লাল
দুর্বিনীত যাপনে সমস্ত সরল উৎসব
টকটকে লাল ! ফিকে রঙ আমি চাই না।
চিটচিটে উপগ্রহবাহিত মুখ থেকে সংযত
শাদা রঙ সরে গেলে আরও ভালো,
সব না বদলাক
তারচে' ঢের ভালো যদি হয় নিঃসঙ্গ পৃথিবী,
কথাকলি জীবনের গ্রহচারী শুধু তুমি আমি
আর মানবিক রক্তের কায়া

আর কোনো রঙ আমি চাই না,

টালমাটাল অসভ্যপ্রেম গুনগুন করা মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম... অশালীন হলে তাই-ই সই

অদ্ভূত আঁধার ধরা চন্দ্রাবলী রাত!
হে লাল, পুড়ে যাওয়া প্রিয় মানুষে
গনগনে আগুনে সাঙ্গ করো সারা ক্ষত
কিশোরী বুকে সরল সদ্য উত্থিত লাল-সূর্য
বেদনার শীর্ষবিন্দু হলে মেঘের উলঙ্গ আকাশে
পুনরপি আমি অনন্ত হবো

আমার জন্ম মৃত্যু আমিই পুরোপুরি বুঝে নেবো আমার মতো করে ভালোবাসা ভালোবেসে যাবো

পৃথা রায় চৌধুরীর কবিতা



তৃতীয় প্রকৃতিতে স্বাগত

বিশ্বাসে মিলিয়ে যায় মেঘলা আরশিজল, রাস্তার তেকোনা ভাঁজে পড়ে থাকে আদুরে ছায়া। বৃষ্টিমন ভিজে গেলে ধেয়ে আসে গ্রহণকাল।

ঈশ্বর এসেছেন, অর্ধনারীশ্বর। প্রকৃতি ডাকছে, অর্ধনারীশ্বর। যুগল কন্ঠস্বরে সৃষ্টির উচ্ছাস। কোনো পুরাণ নামিয়ে আনা হয় না, শুধু স্নানতৃপ্ত ভুলে যায় অভিমান। বেদানার নির্যাসে আতংকনীল দিন ছুটে যায় খুশীগলি। এগিয়ে আসে শিশুনারী। চিনে নেওয়া যায় তার নষ্ট কাজলটিপ।

তিলগ্রাসের প্রলম্বিত দোলকে ধেয়ে আসে দেহগ্রাস।

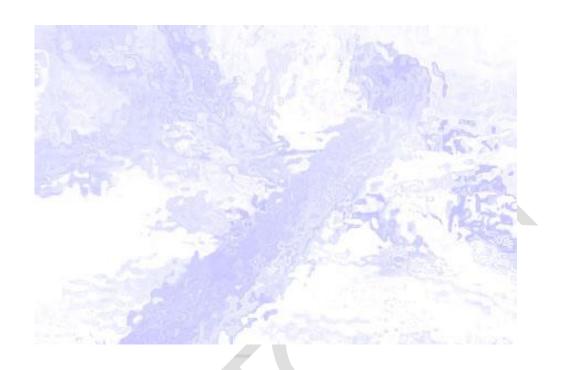
চাইনিজ নয়... চেকার

স্নানরত চাঁদ দেখেছো বহুবার রঙচটা সদরের ঘাটে ঈশ্বর দাঁড়িয়ে। দীঘল যে জ্বালার কাছে আত্মসমর্পণ, তার খোঁজে পালটে যায় আলোহীন প্রান্তর।

সুললিত বেতের আওয়াজে ভেসে আসে মৃদু তন্দ্রাবাতাস।

প্রথম নারীবোতাম খুলতে যে অস্থিরতা দিতীয় নারীবোতামে তাতে মিশে যায়, তৃতীয়র অপেক্ষা। বিশ্বাস করা কঠিন, নষ্টবোতামেরা সাহসী হয়ে যায়!

গন্তব্য পালটে যায়, অ্যাট দ্য টার্ন অফ এ ডাইস... শেষ স্টেশন বলে কিছু হয়না।



ঘাতক উমা মন্ডল

পড়ে আছে শিলনোড়া, বাটাতেল ধূসরের গাঢ়চিত্র থেকে উঠে আসে জ্যোৎস্নাবিহীন মৃত রাত। হয়তো নিশি পোকা খেয়ে গেছে; রক্ত উড়ে যায়

মৃত্যু উপত্যকা কাঁদে শিরায় শিরায়.....

বন্ধ্যা জমি, কাপালিক নীলচাষ করে তন্ত্রশাস্ত্র মেনে; মৃত্যুকাল ঘড়ি দেখে নেয়

বিষের নগরী আসন পেতেছে পঞ্চমুন্ডি খোলে মায়োপিয়া গতি গ্রাস করে পৃথিবীর গায়ে। ছেঁড়া পালকের চক্রব্যুহবিন্দু থেকে সিন্ধু ভবিষ্যুৎ পাঠ করে। মারমেড জানে -

ধ্যানে মগ্ন মৎস্য অবতার....

২.
কড়িকাঠ কথা, ঘুণ ধরেনি তখনও
তবু সরীসৃপ ঘর বেঁধেছিলো
আঁচলের পাড়ে জংধরা চাবি মূক ও বধির
মেঘের খাতায় বজ্র আঁকে ফণা, নদী হয়ে যায়
ভিটেমাটি ইহসুখ...

অন্নপূর্ণা জানে না মঙ্গলকাব্যের দংশন, বেহুলা পুরাণের নীল ক্ষত। রাজমিস্ত্রি ইট বাঁধে দড়ি মেপে, ব্রুটাসের লোভী জিভ টেনে নেয় লক্ষ্মীশ্রীর রক্ত। সাদা খরা জমে বাঁধ অর্ধমৃত, ধূসর যানবাহন তুলে নেয় মুঠো মুঠো মাটি গ্রহণের চাঁদ দেখে নেয়।

৩.হাড়িকাঠ শুধু জানে উৎসর্গের কাব্যগন্ধ শুকে লুপ্ত করে দেয় যতি চিহ্ন, বৈশিষ্ট্যের

কদর করেনা।
গলায় জবার মালা, এক কোপে মুছে যায় জন্ম
কাপালিক সরা ভরে নেয় রক্ত।
চন্ডাল শয়ান দেয় শুধু প্রাণহীন স্থাপত্যের
নশ্বর দেহের তাপ খাবি খায় পঞ্চভূতে, ছায়াপথে

ধর্মরাজ হত্যা ছিলো...প্রত্যেক সুইসাইডে লেখা থাকে ঘাতকের নাম গুপু শব্দে। নীরোর বেহালা বেজে ওঠে সমাধির পাশ থেকে

সুবিনয় দাশের কবিতা



লক্ষ্মীকান্ত শিকদার

খবর শুনি লক্ষ্মীকান্ত শিকদার মাতালের বন্ধু, উধাও আংটিজোড়া টেবিলের উপর থেকে ভাঙা আলমারি, তার ভেতরের কাপড়চোপড়, সজনেডাঁটার চচ্চড়ি ভীষণ প্রিয় মা'র

জলে ভেজা গামছা, আবাসনের

সিকিউরিটি গার্ড, চাক্কাজ্যাম যাকে বিশ্বাস করি তার নামে ফোন ধরি, তাসের আসরে মাল খাই

আর বৃষ্টিকে বলি বাই বাই

কলেজ

কলেজ যেদিকে, তুমি সে
দিকের ছাত্র, যা চাকচিকে শহর
উন্নয়নের ফিরিস্তি, শহরে অটো
দৌরাত্ম্য, ডাক্তারদের কর্মবিরতি
নজর রাখছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন

ইদানীং সকাল সকাল ঘুম ভাঙে না, প্রচন্ড গরম, দিনের তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি পার করবে বলে মনে হচ্ছে প্রাতঃভ্রমনে লোকজন রাস্তার ফুল গাছ থেকে ফুল কুড়োচ্ছে

খবর শোনা যাচ্ছে সকালের

শুভেশ চৌধুরীর কবিতা



টেবিল

শর্ত, আলোর উপস্থিতি
অন্ধকার নেমে আসলে টেবিল মাটি পথ একাকার
মোর মনে তুই আছিস
টেবিলের প্রতিপক্ষ বলে।
ঘাবড়ে যাই
আমার কাছে, আমি ছাড়া সব কিছু আছে
বৈকুণ্ঠ?
হদিস নাই হদিস নাই।
মুঠি খুললে সর্বস্ব, তুই জানিস নাই।

হাতের তালু ধরে আছে আকাশ সর্বস্বান্ত হলে পরেও, ধরে রাখতে পারে মূলধন। টেবিলে মুখোমুখি আমি ও আমার সংজ্ঞা।

ছল

মিথ্যা অভিনয়, মামলা বিবাদ সত্য, ঘুড়ির সুতো কেটে গেলে প্রপাত ধরণিতল। চেষ্টা আয়নায় অভিনয় মুখস্ত না করা মুখোমুখি দাঁড়ানো গাছের কুকুরের বিড়ালের ঝড়ের ফুলের প্রতিবেশীর ক্রেতা বিক্রেতাদের মাঝে প্রস্তুতিবিহীন।



কম্পাস অমিতাভ কর

কখনো সখনো মানুষের কম্পাস খারাপ হলে উত্তরকে সোজাসুজি পূব মনে হয়

মনে হয় সব চায়ের দোকানি, ট্র্যাফিক পুলিশ ষড় করে আছে; কীভাবে ভোলাবে পথ

ফলত মানুষ খালাসিটোলার রাস্তা আর বাড়ি ফেরার সরণি একাকার করে ফেলে মানুষ তখন নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে রাম, শ্যাম সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, "দাদা, বলুন না দাদা, ভুল পথে যাচ্ছিনা তো?"





লালার চিড়িয়াখানা অজিতা চৌধুরী

পাঠশালায়, তার বিচরণ।

ইঁদুরের বাক্সটা ভেঙে গেছে। নতুন একটি বাক্স লাগবে। কত কন্ট করে হাট থেকে সাদা ইঁদুর কিনে এনেছে। টাকা জোগাড় করতে কম মেহনত করতে হয়নি। সরস্বতী, মা'। যার জীবিকা পরিচারিকার, মা'র বেতনটি থেকে কিছু নিয়েছে, বাকিটা তার আয়ের উৎস থেকে। এ বাড়ি ও বাড়ি জঙ্গল সাফের টাকা। কুকুর বেড়াল ইঁদুর খরগোশ নিয়ে, লালার চিড়িয়াখানা। লালার মুখে ঘোর লাগা মায়ার মত আবছা এক পর্দা। তাকিয়ে কথা যখন বলে, মনে হয় পারিপার্শিকতা অনেক দূর। ঘোর লেগে যায় নিজেরও। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্কুলে যাসনা কেন? "মারামারি করে, চিৎকার চেঁচামেচি"। বিবরণ, সত্য মিথ্যা বুঝিনি। কিন্তু লালা স্কুলের পাট ইতি টেনেছে। তার নিজস্ব

মীনা মুখার্জীর কবিতা



সই-কথা ১

হৃদয় কাঁদে, বিষণ্ন এ আকাশ। কস্তুরীগন্ধ মাখা সে ছবির মত গ্রামখানি।

কাজল গাঢ় আঁধার চোখে কত প্রতীক্ষার সরিৎসংগমে — নিবিড় ছায়া তোর, নন্দিতবর্ণে অসহ্য তৃষ্ণার ঢেউগুলো..... সাগরপ্লাবী প্রেমের তরঙ্গ দোলায় ক্রম-নিমজ্জমান....। কী করে ছেড়ে যাই নদী?

তোকে ছেড়ে? তোর রক্তিম আঁচলে আমার কবিতা কাব্য সব বাঁধা। বিক্ষিপ্ত কামনারা শুয়ে থাক তোর আস্কৃত কোলে।

বিষণ্ণতা ছোঁয়া ঝরাপাতার সে মর্মর।
যেন স্বপ্ন স্মৃতির চরাচরে খেই হারালো অনিঃশেষ।
র্নিজনে যন্ত্রণা ভাঙে নদী
তার অগুনতি ঢেউয়ে—
এ সব কবিতার হাটে নৈরাশ্যের দোলাচল,
আশা পীড়িত মৃত্তিকা–সংলগ্ন ইতিহাস ঘন সাময়িক সামাজিক
নির্জন অভিমুখ!
কন্ঠস্বর আকাশে মিলিয়ে!

সই-কথা ২

আকাজ্জার যূপকাষ্ঠে নদীর সে ঘরকন্না, গেরস্থালি। অদম্য আবেগে সে বলেছিল, পৃথিবীর অসীম সত্তার অভিমুখেই আমার এ যাত্রাপথ।

তৃষিত হৃদয়ে আকাজ্ফার অঙ্গার। তীক্ষ্ণ পরাজয়, প্রতীক্ষারত সে চঞ্চল সংশয় মাখা হিংস্ত্র শ্বাপদ কামনারা!
ব্যর্থতায় সে বিবাগী জীবন!
তাই তো এসেছি ফিরে নদী, তোর গিরিবর আঁচলে শ্যামলের কোলে।
পালাবদলের দেশে।
কাশফুলি মেঘেরা কেমন আকাশে ভাসে
মায়াবী বিকেল আসে মদির আবেশে —
রামধনু রঙ ছড়িয়ে
করুণ অভিলাষে!
কি যেন হারিয়েছি আজ?
উচ্ছল চাপল্য মুক্তি?
সে ফাগুনরাতে কুমারীত্ব অবসান নিঃশেষে
ক্রমশঃ ঝানুপাকা গিয়ির বেশে কোমর কষে
বলে সে —
"কেমন ভাল আছি আমি দেখো এসো।"

বিহুল সুখে দুরন্ত বলাকার সাথে মিতালি পাতায় মুগ্ধ মেঘেরা, নদী গোপনে হৃদয় লুকায় বুঝি! তোর হৃদয়ের জং-ধরা ঘরে জীবনের বাঁকে-বাঁকে কত গান আবেগে—কী যে খুঁজে চলেছিস তোর ছলাৎ ছলাৎ জলে? আকাজ্জারা মানেনা মানা, নদী—তারা যে কেবলই সুখ চায়!



অতল নীলাদ্রি ভট্টাচার্য

নিঃসৃত শব্দ প্রতিবিম্বে নিয়মিত প্রবেশ করে শূন্যের আলো।
ইতস্তত বৃষ্টিপাত দুই টুকরো অস্তিত্বে
জল মাখা বিনুনির নিজস্ব অ্যাচিত গন্ধ।
জমাট চোখের কাদায় পা আটকে কান্না পোহায়
মন বারান্দায় সাদামাঠা ফসলের গাত্রফোঁটা।
আহত জন্মের সিঁড়ি বেয়ে রোজ এই পথে আমার অরণ্যময় কাব্যব্যথা
এলোমেলো ভিমরুল খোঁজে বিগতবসন্ত স্পর্শ।



পোড়ামাটির ঘর বিশ্বজিৎ লায়েক

নিজের হারমোনিয়াম থেকে বেরিয়ে আজ
তোমাকে একটু অন্য রকম বাজালাম
মৃদু বাতাসে ভাসিয়ে দিলাম কালো ছায়া
আগে কথা কাটাকাটি হত, তারপরে ঝগড়াঝাটি
বনিবনা নিয়ে আমরা চলে যেতাম গোলমুরি সার্কাস ময়দানে
তিব্বতের রিফিউজিরা ওখানে আসতো শীতের পোশাক নিয়ে
আমরা শীত নিয়ে গিয়ে ফেরত নিয়ে আসতাম মাথা গরম

এখন আর কথা কাটাকাটি নেই, ঝগড়াঝাটি নেই শুধু পড়ে আছে দাগ বিষণ্ন কালো ছায়ার ভিতর কেউ যেন লাফিয়ে ওঠে বসে আছে



বন্ধু কিশলয় গুপ্ত

আমাকে ছেড়ে চলে গেছে যারা তারা সুখে আছে জেনে নক্ষত্র প্রণাম সারি

আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে যারা শীত আসার আগে সনেটগুচ্ছ তাদের জন্য

আমাকে ছেড়ে চলে যাবে যারা ছোটগল্পে রাখি অবান্তর অভিমান

আমাকে ঘিরে রয়েছে যারা মৃত মানুষের ভিড়ে আমিও অক্টোপাশ



ঠা সুতপা চক্রবর্তী

কাঠের চোঙাতে ফুঁ দেওয়া কোনো শক্ত কাজ নয়। প্রয়োজন এক চিমটি আগুনের। যার ভেতরে গনগনা লাল কয়লা বাইরে কালো রুক্ষ খোটটা

হীরককুচি।

তোমার সমস্তটা জুড়ে উনান

কয়লার-মাটির

নক্সাকাটা তাতে।

পাশে কাচের শিশি সলতে পাকানো। উপরে মাচায় একহাট লাকড়ি!

তুমি কার জন্য সবুর কর, রুটি মাখো ডালডা দিয়ে?



ঘুম নন্দিনী পাল

ভাকলেই আসে না
ঈশ্বরের করুণার মতই
লগ্ন, মতি বা খেয়াল হলেই
নেমে আসে দুই জ্র পল্লবের মাঝে
আকাশের গায়ে অধরা বর্ণাঢ্য যেন
মস্তিব্দের দিগন্তবিস্তৃত স্নায়ুর চূড়ায়
উদিত চন্দ্র-তারার নীলাভ ক্লান্তি
পল্লবঘেরা দীঘল ছায়া ধীরে ধীরে ঢেকে দেয়
শুদ্র সমুদ্রের মাঝে কাজলকালো পুক্ষরিণী ঘেরা
বাদামি আলোর দ্বীপটিকে

ঠিক তখনই বিছানায় এলিয়ে পড়ে শরীর।

চিরশ্রী দেবনাথের কবিতা



ভুল ঠিকানায়

একটি ভুল প্যাকেট ফেলে গেছে হেমন্তের পোস্টম্যান খুলে ফেলেছি অযাচিত কৌতূহলে

সযত্নে রচিত পুরনো চিঠির ঝাঁপি
দুজন অচেনা মানুষ মানুষী
তাদের ঘিরে আছে একটি বাড়ি
কোজাগরীর জ্যোৎস্না, নিঝুম বর্ষা
আবছায়া আরো কত আত্মীয় পরিজন
প্রতিবেশী মেয়ের পলাশ গল্প, মহুয়া গান
আমি ছুঁতে থাকি লাইনের পর লাইন, শালবন

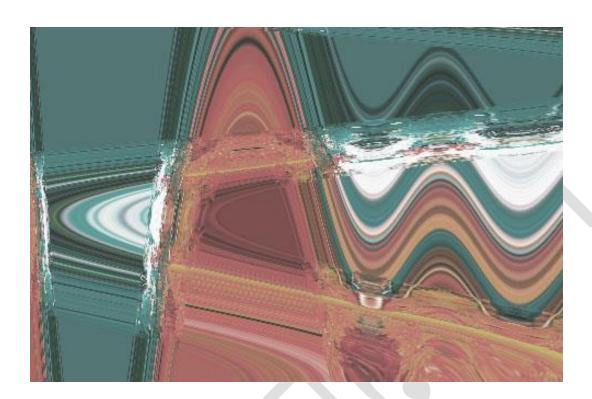
চিঠির নিঃশ্বাস, আমাকে দুভাগ করে একপাতায় ক্ষয়, অন্যপাতায় মধু আমি কেউ নই, তবু যেন কোন এক অশরীরী

এই চিঠিদের ঠিকানা হারিয়ে গেছে তাদের গ্রীবায় সারসের ঝাঁক সূর্যান্তে খুঁজে যায় নীল ডাকবাক্স

আমায় ঢাকছে চিঠির পালক, সবুজ স্ট্যাম্প বলে দিচ্ছে, আমিই তাদের ঠিকানা এই সন্ধ্যায়

অঙ্গরাগ

আমি তোমার অন্য লোক গুহাপৃথিবীতে ঘামছি একা জল খাবে বলে দাঁড়িয়ে আছো ঝর্ণা ঘেঁসে হরিণ হয়ে হাঁটছি পাশে একটুখানি মেঘ করেছে চোখে, তাতেই বৃষ্টি সর্বনাশা এমন করেই শহর জুড়ে তৈরি হয় গভীর বন দশতলাতে কান্না একা ভুলছো শুধু ক্ষিদে পায়, তোমার আমার একইসাথে হাতের তলায় মেঠো খাবার, ঝাল লেগেছে, চাটছি সুখে, আলো নিভিয়ে



জীবন যেমন বনানী ভট্টাচার্য

সবার অগোচরে লেখা হয়ে যায় আলো-আঁধার জীবন, পল-অনুপল, বিস্মৃতির গোপন ফাটল

ষষ্ঠীর রাতে ছয়টি প্রদীপ শিখাই সমানভাবে জ্বলেনা, আঙুলের সেঁকে নতুন পৃথিবীর ভালোবাসা অনুভব করে সদ্যোজাত

কিছু ঋণের ভার আজীবন বহন করতে হয়

কিছু স্মৃতি শব্দভেদী ভাষা জানে অদৃশ্য ক্ষতগুলি এক একটি আগুন হৃদয়কে বৃষ্টিশরীরের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়

প্রশ্ন জাগে মনে, পূর্বাপর সবকিছু যে জানে, সে কী কোনো বিশেষ আমি নয়!

উদয় শংকর দুর্জয়ের তিনটি কবিতা



আগুন ভর্তি জাহাজ

এক অষ্টাদশী সমুদ্রদূহিতা;
পিদ্ধ-স্ট্রবেরি জমা করে দীর্ঘ করেছ স্তন-সমুদয়।
দুর্নিবার স্রোতের বিপরীতে তুমি নিভিয়ে রেখেছ
আকাজ্ঞার জলাঞ্জলি, উন্মাদ সূর্যের কাছে স্টারডাস্ট (কল্পনানুভূতি) ধার করে
বৃত্তের বেহালায় সাজিয়েছ 'সিরিয়াস'(উজ্জ্বলতম তারা)। - বাঁক থেকে
নেমে যাওয়া রেডিয়াম প্লানেটস, এক সজ্জা-ছায়ার পাদদেশে
অবসর বিলাস লিখিয়েছে ব্যাসার্থের পরিচয়।
বিহ্নভরা কামনার 'আইল অফ হোয়াইট' ছেড়ে গ্যাছে

সাত-সাতটি আগুন ভরা জাহাজ। সেই কোন সময়!

পরাবাস্তব জোনাকদল

দহন নিভিয়ে সূর্য-পরাগ।

এ বর্ষা পেরুলেই হিমকাঠ বোঝাই হাওয়ারথ দাঁড়িয়ে থাকবে ত্রিনেত্রে; এক চোখে স্নাত রয়েল-ডক, অন্যাকাশে ধূপজ্বলা শিউলির আধো-গোলাপি ঠোঁট। বিধুর অয়ন ছেড়ে লবঙ্গ বোঝাই জাহাজ এসে ঘ্রাণ কুড়িয়ে নিতেই, বিহুলে লেখা একশ'টা অষ্টোক সুর ভেঙে যখন উড়ে যাবে রহস্যময়ী খমক, তখন তপ্ত পারদে ঢালা প্রপঞ্চের রঙ, মিশে যাবে দগ্ধ অব্রের গলিত ঘ্রাণে। এরপর স্বর্ণকুচি মাখা শরত যেন, পরাবাস্তব মায়ার টানে স্টারলিঙের ডানায় লুকিয়ে পাড়ি দেবে ভৈরবের কোলাহলে।

সপ্তসুর-দগ্ধ-স্নাত-স্বাতি।

সন্ধ্যাকুমারীসেতার হেঁটে এলে জলের পাহাড়, এক অবিরাম ঠুংরি নেমে পড়ে রাত্রি বক্ষে। কতবার খুলে পড়েছে সে উদ্যানের গোপন বাক্সে জমা মাস্তলের ঘুড়ি! তবু উড্ডয়নের প্যারাসুট সংগীত, অচেনা ভেবে পাড়ি দ্যায় আরেকটি মহাকাল।

অকারণ কোলাহল বোহেমিয়ান।

পাথরের উপর পাথর ব'সে, জমাট বরফ খুলে রাখে কপাট; অযুত লহরি ভেঙে, অতিথি হয়ে ওঠে রাক্ষসীর সবুজ চোখ; কর্নিয়ার ফাঁকে পাঁচতারা বিকেল তাড়িয়ে আনে জুনিপার গ্রাম। শরত তখন হরিদ্রাভ আগুন মেখে সবে ভোরের বাদ্য শুনিয়েছে বাকলের কর্ণকূহরে। হিম-রিম-হিম যেন পিয়ানোর রিড থেকে তুলে নিয়েছে আগমনী ট্রাম, হুইসেলের লোকালয়ে বনোহরিনী, পাতার অরণ্যঝোপ থেকে জোনাকদল আলো কুড়িয়ে এনে, কালভ্রমণে প্রহর রেখেছে বাজি।

আলপিনে জড়ানো জ্যোৎস্না

জ্যোৎসার আলপিন বিঁধে আছে অযুত কাল ধরে, রেটিনার চারপাশে; একফোঁটা কান্নার হ্রদে, ভেসে আছে নিস্তব্ধ পাঁচতলা জাহাজ। দুপুরের রঙ ছুটে আসে বিভ্রান্তি ফেলে, একপাল নীল ঘোড়া হয়ে; প্রত্যাহ আকাশ ভাঙে কলতান রুখে, নিশ্বুপ ক্লান্তির ফিনিক্স বেহাগ।

পাল্টাতে এসে মৃদু কলরোল, থেমে গ্যাছে উল্লাসের দল; ভাব্বার বিষাদ লিখে, ফিরে গ্যাছে সোনালি আলবাট্রাস। কখন যেন স্টারলিং সুর চুরি করে গায়, স্বর্ণচাপার গান, এক অষ্টাদশী রোজ তাড়িয়ে বেড়ায় নিরুদ্দেশী পেগাসাস।

ত্রিকোণি রোদ্ধুরে ভেজাতে আসা অঞ্জলির গৃহদ্বার, বিবর্ণ বেহালায় পড়ে থাকে বিভ্রমের কলতান। আর চাইলেও নিকষ ফেরি, উড়ে আসবে না, ছেড়ে পাটাতন। এক অন্যথানে, সমুদ্র থেকে তুলে নেবো, ধুলো সমেত রুপোলি মণিহার।



উহ্য পায়েল দেব

নেহাতই এই শহরের দোষে আলো আর আঁধারের যুগপথে বাকিদের মাঝে একজন কবি জন্মায়।

কোনও ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতা থেকে মাঝে মাঝে লিখে ফেলে কিছু পদ্য এরপর আর বেশি কিছু বলার থাকে না সে চায়, একটা আফশোশ লেগে থাক পাঠকের মনে।

একটা নির্ভেজাল অটোগ্রাফ এক দু লাইন প্রেম দু একটা দ্রোহ কয়েকটা প্রতিবাদ...

তারপর তারা আমৃত্যু নিজেদের চিৎকার গিলে খায়...



মধ্যবিত্ত রফিক উদ্দিন লস্কর

এক আকাশ আক্ষেপে ভরা জীবন
সকাল দুপুর, বিকেল এমনকি সারা রাত
ভাবতে ভাবতে চলে যায় সময়,
মাস গড়িয়ে বছর এমনকি আমৃত্যু হতাশায়।
কারণে অকারণে নানা গুঞ্জন
বাস্তবতার সাথে সংঘর্ষ প্রতিনিয়ত, এটাই ধর্ম।
অদৃশ্য শক্ত দেয়ালে ঘেরা চারপাশ

বড় দুর্বোধ্য, একতিল ও নড়ানো যায়না মাঝরাতে বসে ভাবতে থাকে শুধু, অশ্রু গড়ায়। দিনান্তে সব রাগ পড়ে ঈশ্বরের উপর, পরাজয় ঘটে দিনের পর দিন তবুও এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা।



অন্ধকার জীবন রণজিৎ রায়

নেপালের মাটি থেকে সীমান্ত সেতুতে পায়ে ছোঁয়া লাগতেই আমার স্লিঞ্ধতা মুছে রুক্ষ জীবন লালফৌজের রক্তচক্ষুর সামনে মাটি স্পর্শ করতেই ক্রুরতা রক্তে ধমনীতে হাঁটাহাঁটি।

যুক্তিবাদ হারিয়ে হাততোলা জীবন

সব শেয়ালের হুক্কাহুয়ার মতো আদিম অন্ধকার ভুবন মুখোমুখির সাহস হারিয়ে লেজ গুটিয়ে অন্ধকারে দৌড়াদৌড়ি।

মানস সরোবরের জলে কত যে ম্যাজিক দালাই লামার প্রতিচ্ছবি অতলে প্রাণখোলা হাসির পরিচিত শব্দ ক্রেতা মুছে ধমনীতে গণতন্ত্রের মুক্ত বাতাসের দাপাদাপি।

সমর চক্রবর্তীর কবিতা

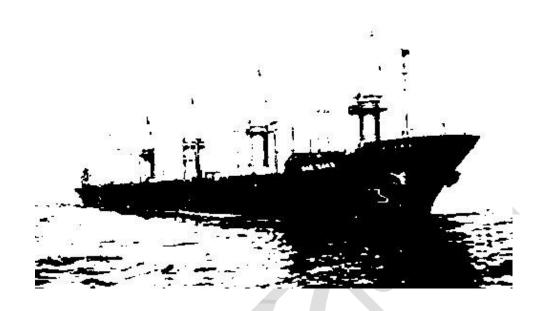


মেলা

মন্ত্রী এসে ফিতে কাটলে গেইট দেবে খুলে তিন তিন তিনটি ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে মানুষ ঘরেতে যায় চলে

চুপ

আমি পথে বসে আছি ।
পথ কখনো আমার খারাপ লাগেনা।
নতুন পথের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যারা এসেছিল,
আজ তা পুরোনোর কথা বলায়
আমার পুরনো পথিট ভেঙে দিয়ে গেছে!
আমার ঘরের সাথে
রাজপথ ধরে আসা
সব পথের মানুষ, শব্দহীন



নিটক্যাল মাইল মেঘনা চটোপাধ্যায়

যতদূর এসেছিলে ভুল করে অথবা খেয়ালে

চোখ রেখে বাতিঘরে বিষণ্ন নাবিক তুমি শোনো

যত জোর ঢেউ দিক নিবিড় নোঙর ছিঁড়েখুঁড়ে

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

তোমার সপ্তডিঙা তার বেশি যাবেনা কখনো

যতদূর এসেছিলে বাসনায় অথবা বিরাগে

গুনে গুনে তত পা'ই অবশেষে ফিরে যেতে হবে

যতই গতির মুখ হাওয়া মোরগের অনুগত

চেনা মন বুঝে নিতে কে আর পেরেছে বলো কবে



উপমাবাহুল্যে ক্লেদাক্ত হতে চাই সঞ্জীব সেন

1

অসীমের করতলে সামান্যকে দান কর আজ, তোমার চেনা বাল্যকাল। বাল্যবিবাহের মত প্রথম রাতে যে ঘুম এসেছিল, তারপর কেটে গেছে অনেক দিন, তুমি ছিলে সেরাতে নীল ঘোড়সওয়ার জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল ক্ষীণ চাঁদ নাভি ভেজা শাড়ি সেই কি লিখেছে এই কবিতা সব,

আমি আসছি শহরের মেয়ে একটু অপেক্ষা কর, আজ উপমাবাহুল্যে নষ্ট হলে আমাকে করোনি তো সংযত সেরাতে আমি পোড়ো বাড়িটার ছাদে খুঁজি তুমি কি কোন আদিমানবী, না সন্মোহনী যে বেশি আয়নাবিলাসী দেখলেই বোঝা যায় সে তার সাম্রাজ্য গোপনে লুকিয়ে রাখে

আর অসুখের রেণু উড়ে যায় তুলোবীজ হয়ে,

২

সে রাতে ঘুমকে শাসন করতে পারিনি, তাই আমায় জাগিয়ে রাখে ভেসে আসে আমার পূর্বজন্মের চেনা রূপচাঁদ মাছের আঁশটে গন্ধ।

আমিই সেই কবি। ডাকনাম কালিদাস। কুমারসস্তবের কবি নই তবে অভিজ্ঞান লিখতে চাই। ফুলের বন্দনা একতরফা ভালবাসা ফুল জানে সেকথা, তবুও ফুলের ভালোই লাগে রাতভোর মিষ্টি সুভাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জানালায় শিউলিছাপা শাড়ি পরে নাভিমূলে অতসী ফুলের ন্যায় শোভা, আমি গ্রামের সাদাসিদে ছেলে শালীনতার ক্ষরণ জানি না। জানিনা কতটা শালীনতা ক্ষরণ হলে কবিতা অশালীন হয়ে ওঠে, তুমি কি বোঝ ফাগুনের চিতল হরিণীর মত ঘুরে বেরাচ্ছ যে।

9

আজ তোমার উপমাবাহুল্যে ক্লেদাক্ত হতে চাই, আমি দেখেছি মৌড়ি ক্ষেতের আড়ালে তোমার প্রাণবন্ত ছৌ নাচ,

বুঝেছি দূরত্ব কত মধুর

শোন উদ্ধত মগ্ন নারী

লুকিয়ে রেখোনা না কোন বিষাদ,

জানোনি যাদের খিদের অসুখ তারাও হাসে, আবার কখনো হাইপুই কুমিররা দুপুরের শীতে লুকিয়ে কাঁদে, এসব বোঝে না শহরের মেয়ে কোনদিন। আজ যদি ভালবাসা না দাও ভালবাসা ডুবে যাবে স্বখাত সলিলে,

এসব আমাদের অজ গ্রামের মেয়েরাও বোঝে তুমি শহরের মেয়ে হয়েও বোঝ না।



আমার শব্দমালা কৃত্তিবাস চক্রবর্তী

আমার শব্দমালা চেনে না আমায়। বলে, তুমি তো আপসকামী
শান্তির ছদ্মবেশে তুমি আসলে ভীরু। বলতো, কী যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়
করিয়েছ আমাদের এতকাল! আমরা তো ক্রমাগত যুদ্ধরত, এছাড়া কীইবা
করার আছে! কখনো ঝুলিয়েছ আকাশ জুড়ে ঝান্ডা, নক্ষএকে করেছ
জ্বলন্ত অঙ্গার, আকাশ থেকে ঝরিয়েছ তুবড়ির স্ফুরণ! হায়! যুদ্ধ তো হলো,
এবার একটু আদুরে বাতাস ভাসাও, একটু উড়ে বেড়াই, একটু হৃদয় জুড়োই।
মুক্তি দাও আমাদের না হলে কবিতার গা থেকে আমরা ঝরাপাতার মতো
ঝরে যাবো। দহরম মহরম তো হলো অনেক, এবার একটু আমাদের দিকে চোখ
তোলো!



ব্রিজটা ভেঙে গেছে কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়

বিজটা ভেঙে গেছে এ-পারের মানুষ আর ও-পারে যেতে পারছে না অথচ একসময় কত হাসি-কান্না, গোল্লাছুট একসাথে

বিজটা ভেঙে গেছে এ সময়ের মানুষ আর ওই সময়ে যেতে পারছে না অথচ একসময় কত তর্কবিতর্ক, শিক্ষা, পরম্পরা, শ্রদ্ধা

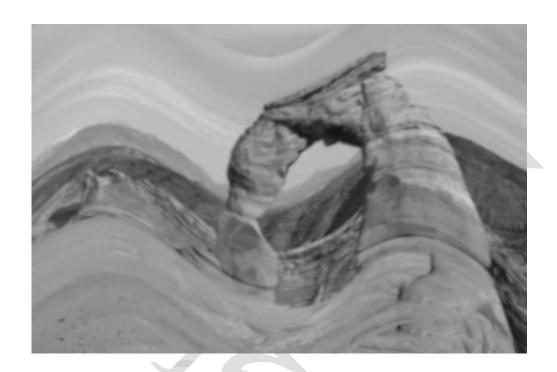
ব্রিজটা ভেঙে গেছে

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

এ-ঘরের মানুষ আর ও-ঘরে যেতে পারছে না অথচ একসময় কত মন ছোঁয়াছুঁয়ি, মান-অভিমান, নিবিড় সুখ

মজবুত ব্রিজ গড়ার কারিগরগুলো দেশ ছেড়ে কোথায় গেল!

সন্তোষ রায়ের দুটি কবিতা



চাকা

এইসব লেখা কাগ্নাভেজা
দাবদাহে শুকলো না একটি শব্দও।
একফোঁটা জল টুপ করে নদী হয়ে যায়।
এতদিন নদীর উৎসে ছিল পাহাড়
আজ থেকে তুমিও-আমিও।
এত জল বসতি কি টের পেয়েছিল!
বাঁকে বাঁকে কথা

নিঃশব্দে মেঘ হয়ে গেল।

পাহাড়ের হাসি — সে কী ভয়ঙ্কর! দেহ ভাঙে, হস্ত-পদ, অস্ত্রের ভাণ্ডার সমেত কামনা ঝনঝন। বজ্রপাতের আগুন ভস্ম করে গেল অভিসন্ধির নতুন বিছানা।

কিছু নেই আর শুধু ওইসব লেখা জল হয়ে ফিরে ফিরে আসে পুনর্বার

সুকান্ত

শেষ আঘাতটি যে করেছিল সে-ই ঈশ্বর বাকীসব তেত্রিশ কোটির জনাকয়।

আমি এক বুদবুদ মাত্র।
এই চোখ খুলি। এই ফেটে যাই।
আবার জীবন নাড়ি — জেগে ওঠে
ফেনা-ফেনা সহস্রলোচন।
তক্ষুনি কারা যেনো বের করে দেয়
ভেতরের বাতাস।

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

এরাই ঈশ্বর। এরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-আর্য-অনার্য তেত্রিশ কোটির কেউ না কেউ অধরা-অদৃশ্য

ঈশ্বরকে ধরতে গেলে নৈবেদ্য জ্বলে ওঠে ফুল-বেলপাতা জ্বলে ওঠে লাল হয়ে ওঠে পূজাপ্রাঙ্গন কাঁপে জুনমাস, পরিত্যক্ত ইতিহাস, ফিরে আসে শান্তি রক্ষক।

আগুন থেকে কেউ দূরে থাকে কেউ ডাকে কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে চেয়ে সুকান্ত ঢলে পড়ে ত্রিতাল রোদের বুকে।



ফেরি দেয় মেঘ বাপ্পা চক্রবর্তী

তোমাকে ফেরিঅলা বললে মন্দ কি তুমি তো কবি।

রচনা ফেরি করে ঘুরে বেড়াও ঘুরে বেড়াও মনোরথে বসে দিক দিগন্ত, তোমাকে কিছু বললে, আমাকে বলা হয়ে যায় এও ঠিক।

পাখিকে কিছু বললে কিংবা গাছকে--কবিতার কোনো অসুবিধা হবে না তো! আমি তোমাকেই সবকথা বলে যাব, কবি আর কবিতায় ফেরি আর বেদুইন

ডুব দিলে জলে মাছ, আকাশে মেঘ, সবাই ফেরিঅলা — আর আমি!

অভিজিৎ চক্রবর্তীর দুটি কবিতা



ফিরেছি আবার

ধুলো ওড়ে পায়ে পায়ে আকাশে আকাশে ওড়ে ধুলো তুমি ভাবো পাখি, ভাবো মহাকাল ঠোঁট দু'টো ছুঁলো এই ধুলো গান হয়ে ছিল বাউলের কালো চোখে ধুলোর অধিক গান ডেকে ডেকে ওঠে, পথ রোখে তুমি ভাবো ঋতু যায় হাওয়ায় হাওয়ায় ওঠে শিস বসন্ত এসেছে ফিরে জঙ্গলে পাতারা হিস হিস এই চলা সংশয়ের, এই গান বিষ ঢালে পথে আমারও যাবার কথা আড়ালে আড়ালে কোনোমতে সব ধুলো মন জানে, সব মনে আকাশের ঠাঁই

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

গানের পরের নদী বাজে আজ দোতারা ছাড়াই সহস্র জনম পরে ফিরেছি মাটির এই দেশে আমার গানের ধুলো ফের সত্য হয়ে ওঠে, হাসে

পরিচিতি

আমি তো কিছু নই শুধু খোলা পথ

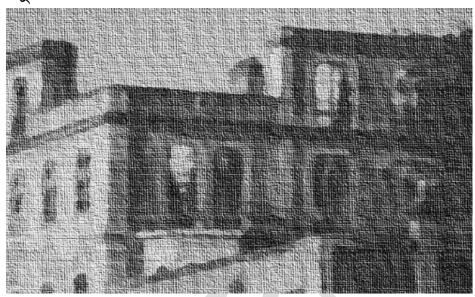
এখন সূর্য উদয়
আর অমাবস্যা একই সঙ্গে
ভোর আর কৃষ্ণপক্ষ একই সঙ্গে
তারাভরা নীল গায়ে দিয়ে

যেন বালি সরাবার জন্য এতটুকু আসা যেন কাঁটা তুলতে তুলতে ভ্রমণ

এছাড়া পাই যা যা নুড়ি কাঁকড় শামুক

রণ আর রণনের রক্তমাখা

পার্থ ঘোষের দুটি কবিতা



অমরত্বের গোপন কথা

তোমাকে কবিতাই লিখতে হবে এমন দিব্যি কেউ দেয়নি।

একটাও কবিতা না লিখে
তুমি কাজ্জিত অমরত্বও পেতে পারো
পেতে পারো শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নীলাভ মৃত্যুটি,
তবে একটাই শর্ত -

অন্তিম ক্ষণের আগে তোমাকেও জানতে হবে তুমিও জীবিত ছিলে এতদিন।

কে জানত

তুমি চাইলেই সহস্র মুদ্রায় একাকীত্বের স্বর্ণমৃগ কিনতে পারো না।

চার দেয়ালের ভিতর উত্তাল ঢেউ উপরে সুবিশাল আকাশ নক্ষত্রখচিত সবুজ গালিচায় ওড়ে দৈব পালক।

শঙ্কাহীন ইঁদুর ছানাদের সাথে ভাব হলে জানতে অপত্যমেহ কাহাকে বলে?

প্রতিটা রাত্রির শেষে মনে হয়-মৃত্যুও এত সুখের হয়, কে জানত?

চিত্তরঞ্জন দেবনাথের তিনটি কবিতা



পোর্ট্রেট

অসুখ গাঢ়তর হলে প্রলাপে নৌকো ভাসে, মাঝিহীন; এতো জল, মাছের সংসারে ঢেউ নেই, নোনা ধরা চাঁদ নেই সেখানে একটাই জানালা, তরল গ্রীল ছুঁয়ে দিলে— আগল খুলে রাখে মাছরাঙার গোপন অ্যামুশ

দুজনের ধীর শুশ্রুষা রাখি যেখানে পাশাপাশি শুয়ে থাকে আমাদের প্রাচীন পোর্ট্রেট

বিশ্বায়ন

পাতার থেকে সালোকসংশ্লেষের বিচ্ছেদে আমি তুমি হলদে হয়ে যাচ্ছি

সব বিদেশ নীতির সই খুঁটে দেখ আমার স্বেদ রক্তের গন্ধ পাবে তুমি আসলে ক্লোজআপ মুহূর্তকে নাম দিই বিশ্বায়ন

টংঘর

অজ পাড়াগাঁ থেকে বেইলি ব্রিজ পেরিয়ে একা হয়ে যাচ্ছে যে সড়ক পর পর ট্রাফিক সাইনে সে সাজিয়েছে তোমার সমুজ্জ্বল মুখগ্রী আখের পাতায় দিনের হলুদ সান্দ্র আলোটুকু রাখা মাইল ফলক থেকে নৈঃশব্য শুষে নিচ্ছে সংখ**্**যা তুমি কি এখানটায় দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নেবে? এই অখ**্**যাত ঝোরার নিপুণ বাঁকে? ছায়ার প্রহরায়?

নাকি এগিয়ে যাবে কোন পাহাড়ি টংঘরের অনুচ্চ নিরালায় যাদের আলোর চাহিদা জানতে হলে ট*্*যাপ করে পড়ে নিতে হয় পাহাড়ের শিরা ?



আত্মহনন সদানন্দ সিংহ

বারো হাত কাঁকুড়ের যেমন তেরো হাত বিচি সাড়ে পাঁচ হাত মোগাম্বোর যেমন চৌদ্দ হাত দাড়ি , টান টান সেসব ঝুলে থাকে এক মহাশূন্যে

দেখো ,আমিই আজ তার স্বাক্ষর বহনকারী , আমিই তার আত্মহননকারী আমিই তার ধ্বজাধারী ,

ওখানে মহাকর্ষ বেহাত হয়ে গেছে বার বারতাই,

ঘিলু ভেদ করে বেরিয়ে আবার ঘিলুতে ঢুকে
মহৎ মহানুভবতার মণিকান্ত মহানিশায় মহেন্দ্র মহেন্দ্রাণীর মহোচ্ছাসএক টান টান মায়ারশ্মির কাছে নতজানুর মাপকাঠির বৃত্তে
দু'শো স্ফুটনাঙ্ক ডিগ্রির ছায়ায় দাঁড়িয়ে হে বন্ধু
ছড়িয়ে দাও পৃথিবীর যত ক্ষোভআক্রোশযত বস্তাপচা কামক্রোধ ,

আমি আগ্রাসে সব গিলে গিলে খাবো, গোগ্রাসে চেটেপুটে খাবো

তবু শান্ত হোক এই বন্দর আর আমার এই আত্মহনন মুহূর্ত ,



ডুব দেবীস্মিতা দেব

আধখানা থিন অ্যারারুটের টুকরোটা
আমারই অসতর্কতায়, গরম চায়ে ডুবে গেল।
কত কীই তো আজকাল এমনভাবেই, চোখের নিমেষে ডুবে যায়।
যা কিছু স্বেচ্ছায় ডুবে যায়,
তাকে ডুবতে দেওয়াই ভালো।
নাহলে তাকে তুলতে গিয়ে, হাত পুড়ে যাবে যে।
জানি, চামচটাকে ডুবুরি বানাতে পারতাম। তবু কেন জানি —

একফোঁটাও ইচ্ছে করল না।

আমারও তো মাঝে মাঝে ওই থিন অ্যারারুট বিস্কুটের মতই ছুব দিতে ইচ্ছে করে।
তবে চায়ের কাপে নয়। জ্বলন্ত আগুনে।
আর জানোই তো,
স্বেচ্ছায় ডুব দিলে —
তাকে ডুবে যেতে দেওয়াই ভালো।



গায়ে পড়ে তোফায়েল তফাজ্জল

গায়ে পড়ে ভিন্নমতকে মটকাতে কথার লহর না লেলিয়ে নিজের চরকায় তেল দাও, কাজে লাগবে। কমে আসবে নাড়ির বিদ্রোহ, চাপে পড়বে অপরাধ প্রবণতা, মরচের দখলে যাবে ধার; ভেঙে পড়বে কারসাজি-বিস্তার, পোঁতা খুঁটি। দেশ ছাড়া হবে অজানা ভয়ের ভুত। কাশফুল বাতাসের ছোঁয়া পাবে জনতার মন।

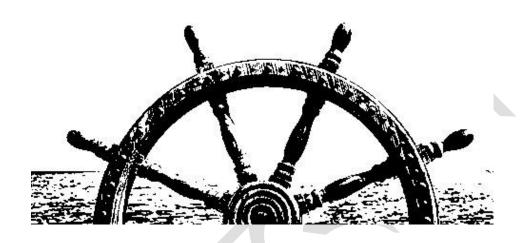
অন্যকে হাসির পাত্র বানিয়ে কী লাভ,

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

কতো কেজি কমে যাপিত যন্ত্রণা, শোকায় কি পূর্বজেরের নালী ঘা? মুছে কি ক্ষতের মোটা মোটা তাজা দাগ?

শক্তির পতনে চোখ কি দেখবে না এর পুনরাবৃত্তির লেলানো বৃত্তান্ত?

এতে, কখন কে টানবে দাড়ি? স্বস্তিরা কখন ঘরে ঘরে?



টুকরো কথা সুদীপ ঘোষাল

অন্ধজনেরও অধিকার রবির আলোয়
নীরবতা বলে অনেক না বলা কথা
পাখি ওড়ে আর হাসে ঘাটে খাঁচা কেন কাঁদে
নদী নারী পুরুষ ঝর্ণা ভালোবাসো সুন্দর মনের সুন্দরী
খোলা মাঠ মনের পাঠশালা
ডিগ্রি র থেকে বড় মনুষ্যত্ব

গাছ জীবন কবি স্পন্দন প্রিয়জন জনপ্রিয় যতই পড়ি আজীবন আমরা ছাত্র

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

পৃথিবী প্রশ্ন উত্তর প্রকৃতি
গরম বাড়ায় শীতলতার প্রতি শ্রদ্ধা
পৃথিবী সমগ্র প্রাণী ও জীব জগতের শুধু মানুষের নয়
উঠোনে একবাটি জল পাখি পান করে
একটাই ছাদ খোলা নীলাকাশ
একই পরিণতি মাটি শুধু মাটি
মাটি বিনা গতি নাই মানুষের কোনো জাত নাই
গোঁড়ামি নয় জ্ঞানই ব্রাক্ষণের পরিচয়



অন্বেষণ সুদীপ্ত বিশ্বাস

সাদা পৃষ্ঠার সামনে চুপ করে বসে আছি
যদি আসে... যদি ধরা দেয়
প্রজাপতির মত রঙিন একটা কবিতা!
যাকে ছুঁতে গেলেই উড়ে যায়
আনমনা হলেই চুপটি করে পাশে এসে বসে।
লুকোচুরি খেলতে খেলতে
রাত নিঝুম হল
তীব্র হল ঝিঁঝিঁর ডাক
চাঁদটাও ঢলে পড়ল দিগন্তে
তবু আমি চোখ জ্বেলে

রাতের পেঁচার মত খুঁজেই চলেছি মেঠো ইঁদুরের মত একটা জীবন্ত কবিতা...

আজকাল সুদীপ্ত বিশ্বাস

নদীতেও সেই নাব্যতা আর নেই
কপট মানুষ মুখোশ তো পরবেই,
মিথ্যে ভেজালে ভরে গেছে গোটা দেশ
আধমরা হয়ে তবুও তো আছি বেশ!
বন্ধুরা সব বন্দুক নিয়ে খাড়া
সুযোগ পেলেই শুট করে দেবে তারা;
চিয়ার্স বলে বাড়ায় মদের গ্লাস,
খাঁটি অভিনয়ে চেনায় নিজের ক্লাস!
প্রেমিকাও জানে, কিভাবে টানলে তবে
মাথা থেকে ধড় এখুনি আলাদা হবে।
ভাই এর হাতেও লুকানো রয়েছে ছুরি!
ধর্ষণ, খুন, রাহাজানি, জোচ্চুরি;
বেড়েই চলেছে দিনরাত অবিরত,
সবার মনেই মনখারাপের ক্ষত।

ছড়া



গরীবের আত্মকথা রফিক উদ্দিন লস্কর

নিঃস্বদের খাবার অভাব নেইকো তাদের ঘর, ছায়াসঙ্গী দুঃখ তাদের থাকে জীবন ভর।

পথে পথে ঘুরছে শুধু পেতেই একটি কাজ, কামাই করতে সৎ পথে নেইকো কোন লাজ।

থাকার মতো জায়গা নেই গরম কিংবা শীতে, কষ্ট করে রাতটা কাটায় ষ্টেশনে বা ফুটপাতে।

শীর্ণ দেহে অলপ কাপড় কেউ করে যে ভিক্ষা, অসুখ বিসুখ হলে পরে কে করিবে রক্ষা!

দুঃখ নিয়ে জন্ম যাদের দুঃখের সাথে লড়ে, ছিন্নভিন্ন জীবন তাদের কাল বোশেখির ঝড়ে।

তারা মানুষ আমরা মানুষ মরার পরেই লাশ, তাদের কাছে মানব জনম ঘটালো সর্বনাশ?

ছড়া



আমপাগ্না দেবীস্মিতা দেব

গজানন মান্না খেয়ে আমপান্না যেমনটা চেয়েছেন সেই টেস্ট পান না। এক ঢোঁক খেয়ে তাই জুড়ে দেন কান্না। বলে দেন সাফ সাফ আর খেতে চান না। বাথক়মে চানে গিয়ে

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

আজ গান গান না।
দুঃখে মুষড়ে পড়ে
অফিসেও যান না।
গিমিকে বলেন না
কী কী হবে রামা।
মনেতে দুঃখ তাই
কিচ্ছুটি খান না।
গিমিরে কেঁদে কন
এটা কোনো ভান না।
নিচ্ছি অফিসে ছুটি

অণুগল্প



গাছ সদানন্দ সিংহ

রবিনবাবুদের নারিকেল গাছটা একেবারেই রাস্তার লাগোয়া। বেশ লম্বা। গাছটার ওপর অংশটা বেঁকে একটু রাস্তার দিকে এসে সোজা ওপরে উঠে গেছে। গাছটায় এখন প্রায় সারাবছরই নারিকেল ঝুলে থাকে। সেই রাস্তায় চলতে গেলেই কমলাকান্তের রীতিমত ভয় হয়। ঢুপ করে তার মাথায় যদি একটা নারিকেল এসে পড়ে তাহলে তো একদম অক্কা। ভয়ে সে রাস্তার মাঝ বরাবর না হেঁটে একদম কিনার দিয়ে দুরু দুরু বুকে হেঁটে রাস্তা পার হয়। এ নিয়ে সে রবিনবাবুকে কয়েকবার অনুরোধ করেছে, গাছটাকে কেটে ফেলার জন্যে। রবিনবাবু হেসে উত্তর দিয়েছেন, গাছটা লাগিয়েছি পনেরো বছর হল, কিন্তু কই,

আজ পর্যন্ত তো কিছুই হয়নি। আপনি মশাই অযথা ভয় পাচ্ছেন। নারিকেল মাথায় পড়ে পৃথিবীতে আজপর্যন্ত কেউ মারা গেছেন আপনি দেখাতে পারবেন? সত্যিই কমলাকান্ত জানেনা, পৃথিবীতে এভাবে কেউ মারা গেছেন কিনা। তাই ভয়ে ভয়ে আগের মতোই রাস্তা পার হয়। এভাবেই দিন যায়।

একদিন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কমলাকান্ত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে রবিনবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একজন লোককে দিয়ে নারিকেল গাছটা কাটাচ্ছেন। কমলাকান্তকে দেখে রবিনবাবু বলে ওঠেন, গাছটা কাটাচ্ছি। কমলাকান্তের বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হয়, তাই সে বলে, আজ হঠাৎ! এতোদিন তো আপনি রাজি হন নি!

রবিনবাবু উত্তর দেন, তাতে কী, শেষে আপনার কথা তো রাখতে পেরেছি। কমলাকান্ত বেশ খুশি হয়। চলে যায়।

আসল ব্যাপারটা কমলাকান্তের কোনোদিনই জানা হয়না যে, গাছটা থেকে একটা নারিকেল আছড়ে পড়ে রবিনবাবুর গিন্নির আদরের বেড়ালের এক পা ভেঙে গেছিল বলে রবিনবাবুর গিন্নিই আদেশ দিয়েছিলেন গাছটাকে কেটে ফেলার জন্যে।

অণুগল্প



ভ্রান্তি রণজিৎ রায়

মুখে ফিসফিস না করলেও সবার চোখের ভাষায় সন্দেহ, কৌতূহল আর প্রশ্নবোধক চিহ্ন। কৈলাস মানস সরোবর যাত্রাকে অভিযান বলাই যুক্তিযুক্ত। মৃত্যু যেন শিকারি বাঘের মতো ওঁত পেতে আছে সর্বক্ষণ। যাকে নিয়ে সন্দেহ, তার মতো পরোপকারী মানুষ হয় না। সবার বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশ্বানন্দ উচ্চশিক্ষিত। কানাডায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। দক্ষিণ ভারতীয় হলেও চমৎকার হিন্দি জ্ঞান। যাকে কেন্দ্র করে সে সন্দেহের ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছে, সে পাঞ্জাব সুন্দরী। ফিগার, রঙ, হাসি প্রশ্নাতীত। সেজন্যেই সবার সন্দেহের ঘনত্ব এতটা তীব্র।

কৈলাস মানস সরোবরের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করে যতই আপ্লুত ও তৃপ্ত হোক না কেন তীব্র মাথা ব্যথা ও খাবারে অরুচিতে সবাই নাজেহাল। প্রতি মুহুর্তে হাই অলটিটিউডের নীরব আক্রমণে তটস্থ সবার মন। এসব উটকো সমলোচনা করার ফুরসত কোথায়! তাছাড়া দক্ষিণভারতীয়রা বাঙালিদের চাইতে পিএনপিসিতে খানিকটা পিছিয়ে। বাঙালিরা নাকি ভারী বোঝা বইতে কষ্ট হলেও, সে বোঝা মাথায় নিয়ে দিব্যি পিএনপিসি চালিয়ে যেতে পারে। বিন্দুমাত্রও ক্টেবোধ করে না।

ফিরে এসে কাঠমান্ডুর রাজকীয় হোটেল ম্যানাঙ্গএ ডিনারে গেলাম। মুখোমুখি বিশ্বানন্দ। হাত ধরে আছে পাঞ্জাব সুন্দরী। এড়িয়ে গিয়েও সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে ওকে ইশারায় একান্তে ডেকে এনে বললাম, বিশ্বানন্দ! খুব বিপদে পড়লাম। ভোর হলেই এয়ারপোর্ট চলে যেতে হবে। গাইডকে বলেও চাইনিজ মুদ্রা ইয়ান চেঞ্জ করতে পারছি না। তুমি কি খোঁজ নিয়ে একটু দেখবে? সমস্যায় পড়ে স্বাই তোমাকে বিরক্ত করে। এমনকি ডিনারে এসেও তোমাকে বলতে বাধ্য হলাম।

এবার সে দেবদূতের মতো জিজ্ঞাসা করে, আক্ষেল! চাইনিজ ইয়ান কি সাথে আছে? থাকলে সব এখুনি দিন। খোঁজ নেবো কী? আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি। আমরা বিকেলের ফ্লাইটে যাবো। আপতত আপনি নিয়ে চলে যান। আমি একটা ব্যবস্থা করবো। হাতে কয়েকঘণ্টা সময় পাবো।

এ কথা বলেই আমার ইয়ান গুনে মোবাইল ক্যালকুলেটরে হিসেবে করে পুরো ভারতীয় টাকা আমার হাতে তুলে দেয়। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, খুব উপকার করলে বিশ্বানন্দ। এগিয়ে যাও, তোমার বান্ধবী অপেক্ষা করছে। বিস্মিত বিশ্বানন্দর প্রশ্ন, বান্ধবী কাকে বলছেন আঙ্কেল? রচনা আমার ওয়াইফ। সে একজন নামি ডেন্টিষ্ট।

--- ওয়াইফ! তাহলে সে অন্য মেয়েদের রুমে থাকে কেন?

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

হেসে গড়িয়ে পড়ে বিশ্বানন্দ। হাসি থামিয়ে বলে, ওরা আমার বোন। ওদের সাথে একই রুমে থাকে। কার্তিক আমার বেস্টফ্রেন্ড। একা এসেছে। আমরা দুই বন্ধু একই রুমে থাকি।

রচনার কাছে বিশ্বানন্দ যেতেই নানা প্রশ্ন। কোনো উত্তর না দিয়ে ওরা টেবিলে গিয়ে বসে। যেখানে দুবোন আগেই বসে রয়েছে। এবার দূর থেকে খুঁটিয়ে দেখলাম, প্রতিভা আর অনুরাধার চেহারায় বিশ্বানন্দের চেহারার সাথে অনেক মিল।

অণুগল্প



বাস্তব লোপামুদ্রা সিংহদেব

দরমার দরজা ঠেলে মিন্টু দৌড়ে ঘরে ঢোকে, চোখে মুখে ভয়। এতো সকালে ছেলেকে দেখতে পেয়ে মার মনেও প্রশ্ন ভিড় করে আসে, আশক্ষাও। ছেলের কপালের কাটা দাগটা আশক্ষাটা বাড়িয়ে দেয়। কি হলো প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গুপিয়ে কেঁদে ওঠে মিন্টু, বলে "মা সনাতন কাকা তোমারে মিথ্যে বলে নিয়ে গেছে আমারে। বাড়ির সব কাজ করায় আমারে দিয়ে, তারপর রাতের বেলা ব্রাউজের হুক লাগানোর কাজ। একটু চোখের পাতা লেগে এলেই জোটে মার। আমি পালিয়ে এসেছি মা — কাল রাতের বেলা আমারে খুব মেরেছে — আজ সকালে জল ভরবার বাহানায় বালতি নিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে এসেছি। মা, মাগো আমি আর যাবনা মা—।"

তেরো বছরের মিন্টুর কথা শুনতে শুনতে চোখের জলে বুক ভাসে মানদার, সঙ্গে সঙ্গে ভয়টাও চাগাড় দেয়। গ্রামের ছেলে সনাতন ঠিক আসবে মিন্টুর খুঁজে। মিন্টুর বাবা মারা যাবার পর সনাতন দর্জি এসে কতো ভালো ভালো কথা বলে ছিল, 'তোমার ছেলেকে আমাকে দাও, ওকে আমি আমার মতন বড়ো দর্জি বানাবো মানদা। দেখবে তোমার পয়সার অভাব থাকবে না"। কত আশা করে পাঠিয়েছিল ছেলেটাকে — এই তার পরিণতি। ছেলের চোখের জল মুছিয়ে আদর করে মানদা। কিন্তু না, ছোট ছেলে মেয়ে দুটো ঘুম থেকে উঠে ওকে দেখে ফেলার আগেই মিন্টুকে পাঠিয়ে দিতে হবে দূরে -- ওই পিশাচটার নাগালের বাইরে। মিন্টুকে রাতের বাসি রুটি গুড় আর দুটো টাকা দিয়ে মানদা বলে -- "পালা মিন্টু, সবার চোখ এড়িয়ে তুই পালা, নাহলে রাক্ষসটা তোরে আস্ত রাখবে না। তোরে খুঁজতে ঠিক আসবে এখানে — তুই পালা"। ভয় গ্রাস করে মিন্টুকেও। মাকে একবার জড়িয়ে ধরে, তারপর দরজা দিয়ে ছুটে বের হয়ে যায় নাম না জানা গন্তব্যে। দৌড়োতে দৌড়োতে স্টেশনে এসে চেপে বসে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের কামরায়। জীবনে এই প্রথম তার ট্রেনে চড়া। হুইসল বাজিয়ে ট্রেন ছাড়লে শ্বাস টানে বুক ভরে — কটা স্টেশন পার হয়ে যাবার পর টিকিট চেকারের নজরে পড়ে সে। "কিরে টিকিট কোথায়"? ভ্যাবলার মত চেয়ে থাকে অজ্ঞ মিন্টু। টিকিট বাবুর একটু দয়া হয়, বলে "বাড়ি থেকে পালিয়েছিস বুঝি — সামনের স্টেশনে নেমে যাবি"।

নাম না জানা শহরে এসে পড়ে মিন্টু। মার দেওয়া রুটিটা খায়, জল খায় পেট ভরে। রাস্তা পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাজারে এসে পড়ে, অবাক বিসায়ে দেখতে থাকে সারি সারি খাবারের দোকান, মনোহারী, খেলনা, জামাকাপড় আর ও কত কিছু সাজানো দোকান। তাদের গ্রামে তো সে এত দোকান কোন দিন দেখেনি। বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়, ক্ষিধে তেষ্টায় ক্লান্ত মিন্টু পকেটের দুটো টাকা সম্বল করে একটা খাবারের দোকানে এসে দাঁড়ায়। শুনতে পায় দোকানদারের

বিলাপ—'ছোটু হতভাগাটা জ্বর বাধিয়ে বসল এখন এই বাসনের কাঁড়ি ধোবে কে, কি যে করি'। মিন্টু যেন হাতে চাঁদ পায়, দৌড়ে গিয়ে দোকানিকে বলে "কর্তা, আমারে দেন না, আমি বাসন কটা মেজে দি"। দোকানি ক্লান্ত, অবসন্ন মিন্টুকে জরিপ করে খানিকক্ষণ, বলে "কোথা থেকে উদয় হলে বাবা? চুরি-টুরি কের ভাগবে না তো"? মিন্টু র পেটে ক্ষিধে মোচড় দেয়, সে বলে- "আজ্ঞে কর্তা, আমারে বিশ্বেস করেন, বড় ক্ষিধে লেগেছে, পয়সা পেলে একটু কিছু খেতে পাই"।

দোকানি সুযোগ হাতছাড়া হতে না দিয়ে মিন্টুকে বসিয়ে দেয় বাসন ধুতে। বাসন মাজতে মাজতে ক্লান্ত মিন্টু দেখতে পায়, রাস্তা দিয়ে চলেছে এক বিরাট মিছিল, ছোট-বড়, মাঝারি কত মাপের মানুষ হাতে কী সব লেখা বোর্ড নিয়ে চলেছে। মুখে তাদের স্লোগান--'বাল শ্রমিক প্রথা বন্ধ কর, বন্ধ কর, শিশুদের ওপর অত্যাচার চলবে না, চলবে না, শিশুদের শিক্ষার অধিকার দিতে হবে দিতে হবে.....।' অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে মিন্টু — পেটটা ক্ষিধেয় মোচড় দিয়ে ওঠে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে অসহায় মা আর ভাই-বোন দুটোর মুখ। সে রোজগার না করলে কি করে চলবে? থেমে যাওয়া হাতটা হঠাৎ দ্বিগুণ জোরে কড়াইটা ঘষতে থাকে — শহরের বাবুরা অমন বলেই থাকে — সে কথা শুনলে মিন্টুর চলবে কেন!

সম্পাদকীয়

ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে আসছে — কেন এসব করছেন? মানে কেন এতো লিটিল ম্যাগ, ব্লগজিন এবং ওয়েবজিন বের হচ্ছে? সোজাসুজি একথার অর্থ — অনর্থক এগুলি চারিদিকে গজিয়ে উঠছে। একথার উত্তর দেবার মতো কিছুই ছিল না যদি প্রশ্নটা সাহিত্যের বেরসিকদের কাছ থেকে আসতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এসব প্রশ্ন যাঁরা তুলছেন তাঁরা সবাই লেখালেখির সাথে যুক্ত। উত্তরে কেউ যদি বলেন যে সাহিত্যকে মনেপ্রাণে ভালোবাসি বলেই নিজেরাই টানা পরিশ্রম করে, অমূল্য সময় অপচয় করে এবং আর্থিক ক্ষতি নিয়েই এগুলি করা হচ্ছে। এই উত্তরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নকর্তা-প্রশ্নকর্ত্রীদের কাছ থেকে তৈরি করা যে প্রশ্নটি আবার ভেসে আসে সেটা হলো – কে বলেছে আপনাকে এসব করতে? কে বলেছে আপনাকে পরিশ্রম করতে? কে বলেছে আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করতে ? কে বলেছে আপনাকে আর্থিক ক্ষতির দায় নিতে? আর এসব অর্বাচীন প্রশ্নের ফলে লিটিল ম্যাগ, ব্লগজিন এবং ওয়েবজিন কি বন্ধ করে দেওয়া হবে? নিশয় না। কারণ যাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরাই অনর্থক তুলেছেন, আবার তাঁরাই পাঠক পাঠক করে চেঁচামেচি করেন। সেই প্রাচীন কাল থেকেই লিটিল ম্যাগ পাঠক তৈরি করে এসেছে। সময়ের তালে তালে ডিজিটাল ব্যবস্থা এসেছে ব্লগজিন-ওয়েবজিনের মাধ্যমে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটাকে আজ কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। ইতিমধ্যে পাশ্চান্ত্য দেশের অনেক লাইব্রেরিই পুরোপুরি ডিজিটাল হয়ে গেছে। আর এখানে যাঁরা লিটিল ম্যাগ, ব্লগজিন এবং ওয়েবজিন করছেন তাঁরা প্রায় সবাই লেখালেখির সাথে যুক্ত, তাঁরা তো সাহিত্যকে ভালোবেসে এসব করছেন এবং করেও যাবেন; গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল গোছের লোকেরা কে কী বলল তাতে কিছু এসে যায়না। আর কেউ যদি লিটিল ম্যাগ, ব্লগজিন এবং ওয়েবজিন নিজের দায়িত্বে করেও থাকেন, তাঁরা তো সমাজের ক্ষতি, মানুষের ক্ষতি মোটেই করছেন না। বরং পাঠক তৈরি করছেন, নতুন লেখক তৈরি করছেন। লেখক নিশ্চয়ই চান না, তিনি যা লিখছেন সেটা আস্তাকুঁড়েই পড়ে থাকুক। সব লেখকই চান তাঁর লেখাগুলি প্রকাশিত হোক। যাঁরা এসব অবান্তর প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁরাও চান তাঁদের লেখাগুলির যে-কোনো ফর্মে প্রকাশ ঘটুক। এখন কেউ যদি মনে করেন তিনি ফেসবুক বাদে অন্য কোথাও প্রকাশ করেন না, তিনি আমাদের নমস্য। তাঁর জন্য আমার এ লেখা নয়।

মুখোমুখি



লোকটা সদানন্দ সিংহ

কী নাম দেবো তাকে? রাজীবলোচন ? পদ্মলোচন ? ভীমারাও ? নাকি অজিতাভ ? তার নাকি অজ্ঞ নাম। এ নামগুলি নাকি ভালোবেসে তাকে লোকেরাই দিয়েছে। তা হোক, কিন্তু সে আমার দ্রয়িংকমে সরাসরি ঢুকে পড়লো কাকর অনুমতি না নিয়েই। আর আমার মতো যাচ্ছেতাই লোকের ওপর সে ভর করার চেষ্টা চালালো। বয়স তার পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ। গায়ে পাজামা-পাঞ্জাবি। চোখে এক কালো চশমা। কাঁধের ঝোলা থেকে এক ঢাউস বিভিন্ন পত্রিকার কাটিং এবং ফটো আর সার্টিফিকেটের বাঁধানো খাতা নাকি বই, কী বলব ভেবে পাইনা।। বহুদিন ধরে এগুলি জমিয়েছে বোঝা গেল। নিজেকে এক পরিত্রাতা

বলে জাহির করার চেষ্টা চালালো। বহু লোকের সঙ্গে তার ফটো। বহু লোক তাকে টাইপ করে বা হাতে লিখে সীল-সই দিয়ে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। লোকগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার লোক। কেউ সরকারি বড় অফিসার, কেউ ব্যবসায়ী, কেই স্কুল টিচার, কেউ রাজপরিবারের, মানে সাধারণ লোক থেকে কেউকেটা বিভিন্ন ধরনের লোক তাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। লোকটা সরাসরি আমার কাছ থেকেও একটা সার্টিফিকেট চাইল। আমি বললাম, আমি এক সাধারণ লোক, আমার সার্টিফিকেট দিয়ে তোমার কোনো লাভ হবে না। আমার কথা শুনে সে বলল, আমি তো লাভের জন্যে সার্টিফিকেট চাইছি না। আপনার সার্টিফিকেট আমি আমার এই বান্ডিলের সংগ্রহের মধ্যে রেখে দেবো। লোকটি এবার জল খেতে চাইল। আমি ওকে এক গ্লাস জল দিলাম। ঢক ঢক করে খেয়ে নিল। খালি গ্লাসটা টেবিলে রেখে সে এবার আমাকে বললো, আপনাকে আমি একটা পান্নার পাথর দিচ্ছি। এই পাথরটা আংটির মধ্যে ধারণ করে পরবেন। আপনার গ্রহদোষ কেটে যাবে।

আমি হেসে বললাম, আমার কোনো গ্রহদোষ নেই ভাই। কিছুই দিতে হবেনা। লোকটা এবার নাছোড়বান্দা, কোনো মূল্যই নাকি এখন নেবে না। আমাকে সে দেবেই।

আমি এবার সত্যি কথাই বললাম, ভাই আমার এসবে বিশ্বাস নেই। আমি এসব নিতে পারবো না।

লোকটা আমাকে একটা কাগজে এঁকে গ্রহগুলি কখন কী করে মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে এসব আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

বুঝলাম, ওর সঙ্গে আমি যত 'না না' করব, তত সে আমাকে বিভিন্ন ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে যাবে। তাই বললাম, আমি এবার বাইরে যাব। লোকটা এবার আমার কাছ থেকে আবার সার্টিফিকেট চাইল। এবার বলল, ঠিক সার্টিফিকেট না, আপনি শুধু লিখে দিন আপনার সঙ্গে আমার আজ দেখা হয়েছিল আপনার রুমে।

লোকটাকে বিদেয় করার জন্যে আমি তাই লিখে দিলাম। লোকটি চলে গেলে আমি একটু চিন্তায় পড়লাম, ওই কাগজের ওপরে লোকটা যদি আরো কীসব লিখে ফেলে তাহলে তো অনেকের কাছে আমি এক অন্য আমি হয়ে যাবো না? তাড়াতাড়ি আমি লোকটাকে খুঁজতে বাইরে বেরুলাম। দেখলাম লোকটা হাওয়া হয়ে গেছে।

আলোচনা

সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ

সাহিত্য, সাধারণ অর্থে, মানুষের ভাব প্রকাশের এক মাধ্যম বা অভিব্যক্তি যা লিখিত এবং কোনো আধারে ধরা থাকে। অবশ্য লিখিত ফর্মের বাইরেও যে লোকসাহিত্য আছে তার গুরুত্বও অপরিসীম এবং ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ। তবে আমাদের সমস্ত লিখিত অভিব্যক্তিই কিন্তু সাহিত্য নয়। লিখিত অভিব্যক্তি যখন এক শিল্পের রূপ নেয় তাকেই সাহিত্য বলতে পারি। আর প্রতিবছর সাহিত্যের জন্যে যে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় সেটাকেই সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার বলে মনে করা হয়।

আশ্বর্যের বিষয় হলো এবছর ২০১৮ সালে সাহিত্যের জন্যে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হবে না বলে সুইডিশ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন। কারণটা আরো আশ্বর্যজনক — crisis around sex abuses যার জন্যে সুইস একাডেমির বেশ কিছু সদস্যকে পদত্যাগ করতে হয়। কেউ কেউ আবার আর্থিক লেনদেনের প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন।

সব গণ্ডগোলের একটা একটা উৎস দেখা যায় — অর্থ এবং সেক্স। সেটা এখন নোবেল প্রাইজেও ঢুকে পড়ল।

লেখজমা

ঈশানকোণ দেয় ভাল লেখা প্রকাশের গ্যারান্টি। আপনার ভাল লেখাটি এখনই পাঠান। লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

- * ইন্টারনেটের যেকোনো জায়গায় প্রকাশিত লেখা পাঠাবেন না ।
- * বহুল প্রচারিত নয় এমন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখা পাঠানো যাবে । তবে খুব প্রচারিত এমন লিটল ম্যাগাজিন, দেশ, আনন্দবাজার সহ অন্যান্য কমার্শিয়াল পত্র- পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা পাঠাবেন না। তবে নতুন লেখাই কাম্য ।
 - * যেকোনো লেখা পাঠাতে পারেন । চিত্রকলা, এমন কি ভ্রমণকাহিনিও।
 - * লেখা পাঠালে ধরে নেওয়া হবে সমস্ত নিয়ম মেনেই আপনার মৌলিক লেখাটি পাঠাচ্ছেন ।
- * লেখা মনোনীত হলে ইমেল-এর মাধ্যমে দুমাসের ভেতর জানিয়ে দেয়া হবে যদি লেখক / লেখিকার ইমেল-এর ঠিকানা দেয়া থাকে ।
 - * लाখा जल वाश्ना किरवार्छ मिरा नित्थ रिप्तन-वत प्राधारा शांघीरन ।
 - * ভাল লেখা এলে নতুন বিভাগ খোলা যেতে পারে।
 - * লেখা নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ।
 - * লেখা WORD বা OPEN OFFICE ফাইলে পাঠাবেন, PDF বা অন্য ফাইলে পাঠাবেন না। এছাড়া ইমেলের বডিতে লিখেও পাঠাতে পারেন।
 - * অমনোনীত লেখাগুলি লেখক-লেখিকাকে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে ইমেল এর মাধ্যমে।
- * আপাতত বছরে চারটি সংস্করণ JAN-FEB-MARCH, APRIL-MAY-JUNE, JULY-AUG-SEPT ও OCT-NOV-DEC নাগাদ বেরুবে। আগামী সংখ্যার জন্য আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এখনই । স্কেচ সহ পারলে পাঠান।
 - * ইমেল-এর মাধ্যমে লেখা পাঠাবার ঠিকানাঃ--singhasada@gmail.com
 - * লেখা ফেসবুকে ইনবক্সে নিম্নলিখিত লিংকেও পাঠাতে পারেনঃ-https://www.facebook.com/sadananda.singha.9

Hello: 9051456361 / 9436128354

এছাড়া আলোচনার জন্যে পত্র-পত্রিকা পাঠাতে পারেন নিচের ঠিকানায়ঃ- পদ্মা সিংহ

CO নন্দালয়, লাইফড্রপ ওয়াটার প্ল্যান্টের পেছনে, অভয়নগর, আগরতলা। PIN-799005

[লেখক-লেখিকাদের প্রতি একান্ত অনুরোধ লেখা পাঠিয়েই ঈশানকোণ প্রকাশের আগে সেই পাঠানো লেখাটি ইন্টারনেটের যেকোনো জায়গায় নিজে বা অন্যের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন না দয়া করে]